Copula: Jahangirnagar University Studies in Philosophy, Vol. XXXII, June 2015

নিবিড় প্রতিবেশবাদ প্রসঙ্গে আর্ন নায়েসঃ জীবমণ্ডল সমতাবাদ, অন্তর্নিহিত মূল্য ও প্রতিবেশগত আত্মা সম্পর্কিত বিতর্ক মূল্যায়ন

এ. এস. এম আনোয়ারুল্লাহ ভুঁইয়া*

[সারসংক্ষেপ : পরিবেশ সংকটের উৎস অনুসন্ধানে উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ধারাসমূহ হলো : প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ,পরিবেশবাদ, প্রতিবেশ নারীবাদ, আমুল পরিবেশবাদ ও নিবিড় প্রতিবেশবাদ। নিবিড় প্রতিবেশবাদ (deep ecology) দাবি করছে যে, শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই পরিবেশ সংকটের একমাত্র উৎস নয়। এ সংকটের উৎস নিহিত রয়েছে আমাদের মনোজগত, বিশ্বাস ও আদর্শের মধ্যেও। একারণে এ মতবাদ ধর্মতাত্ত্বিক ও অধিবিদ্যক দিক থেকে সংকটের স্বরূপ ও সমাধান অনুসন্ধান করছে। অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে এ মতবাদ দাবি করছে যে — আমাদের চারপাশের জাগতিক পরিবেশের উপর সংঘটিত আমূল পরিবর্তনকে অনুধাবনের জন্য পরিবেশ সম্পর্কিত আত্মোপলব্ধি প্রয়োজন। আত্মোপলব্ধির বিকাশের জন্য কিছু মৌলিক প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন : পরিবেশের উপর মানুষের ভূমিকা কি? এ মতবাদ কি সংগতির্পূণ পরিবেশ সংবেদনশীলতা নির্মাণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম? প্রকৃতি ও ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক কি অ-পারস্পরিক (non-relational) নাকি পারস্পরিক (relational)? নিবিড় প্রতিবেশবাদ যে জীবমণ্ডলগত সমতাবাদের (biospherical egalitarianism) প্রস্তাব করেছে তা কি সমতার সমকালীন জ্ঞানকে সমর্থন করে? উপর্যুক্ত প্রশ্নসমূহ বিবেচনায় রেখে নিবিড় প্রতিবেশবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমালোচনাসমূহ পুনর্মূল্যায়ন করাই উক্ত প্রবন্ধের লক্ষ্য।]

ভূমিকা

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া পরিবেশ সংকট মোকাবেলার জন্য ষাটের দশক থেকে বিশেষজ্ঞগণ বহুমুখী প্রকল্প ও উপায় নিয়ে ভেবে আসছেন। তন্মধ্যে দুটি ব্যাপক আলোচিত উপায়ের একটি হলো : অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত কাঠামোর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি (piecemeal approach)। অন্যটি হলো — পরিবেশ ও মানুষের আন্তঃসম্পর্কের সমালোচনমূলক মূল্যায়ন (critical approach)। দ্বিতীয় উপায়টির মূলকথা হলো : সামাজিক সম্পর্ক মানুষের জীবনের উপর যেমন প্রভাব ফেলে, একইভাবে মানুষের কর্মকাণ্ড তথা পরিবেশের উপরও প্রভাব ফেলে থাকে। পরিবেশের

* Professor Dr. A S M Anwarullah Bhuiyan, Department of Philosophy, Jahangirnagar University.

উপর মানবসৃষ্ট এসব সংকটের বিমূর্ত দার্শনিক চরিত্র ও বস্তুনিষ্ঠ সমাধান সম্পর্কে জানিয়ে থাকে *নিবিড় প্রতিবেশবাদ* (deep ecology)।

সত্তর দশকের শুরুতে আর্ন নায়েস *নিবিড় প্রতিবেশবাদ* শিরোনামে পরিবেশবাদী দর্শনের প্রস্তাব করেন। তাঁর ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ফক্স, জর্জ সেশন, বিল দেভাল ও ফ্রিয়া ম্যাথুজ প্রমুখ পরিবেশ দার্শনিক। আশি ও নব্বইয়ের দশকে গোড়ার দিকে বিল দেভাল (1985, 1988) ও জর্জ সেশন (Sessions, 1995) নিবিড় প্রতিবেশবাদের সংস্কার সাধন করেন। ভারভাইক ফক্সও (Fox, 1990) এ মতবাদের বিকাশে অবদান রেখেছেন। ফক্স বহুব্যক্তিক মনোবিজ্ঞান (transpersonal psychology) ও নিবিড় প্রতিবেশবাদী ধারণার সমন্বয় করে বহুব্যক্তিক প্রতিবেশবাদের (transpersonal ecology) প্রস্তাব করেন। প্রশ্ন হলো : পরিবেশবাদী দর্শন হিসেবে নিবিড় প্রতিবেশবাদ কতোটা সংগতিপূর্ণ? এ মতবাদ কি পরিবেশ সংবেদনশীলতা নির্মাণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে সক্ষম? এ মতবাদে প্রকৃতি ও ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে যে সম্পূরক জালের কথা বলা হয়েছে তা কি অ-পারম্পরিক (non-relational) নাকি পারম্পরিক (relational)? ব্যক্তি-আত্মার সঙ্গে বৃহত্তর আত্মার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এ মতবাদ যে বহুব্যক্তিক মনোবিজ্ঞান (interpersonal psychology) ও জীবমণ্ডলগত সমতাবাদের (biospherical egalitarianism) প্রস্তাব করেছে তা কি সমতা ও মনোবিজ্ঞানের সমকালীন বিকাশকে সমর্থন করে? উপর্যুক্ত প্রশ্নসমূহ বিবেচনায় রেখে নিবিড় প্রতিবেশবাদ সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা উপস্থাপন করা হবে। সেই আলোকে নিবিড় প্রতিবেশবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমালোচনা ও এদের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়াসই উক্ত প্রবন্ধের লক্ষ্য।

২. নিবিড় *প্রতিবেশবাদ প্রসঙ্গে আর্ন নায়েস*

নিবিড় প্রতিবেশবাদে *নিবিড়* (deep) ধারণাটি দ্বারা মানব বাসস্থল, মানুষের আদি উৎস ও তার জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের স্বরূপ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার কৌশলকে বুঝিয়ে থাকে। পরিবেশ সংকটের সঙ্গে সম্পৃক্ত যেকোনো প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর অনুসন্ধানের জন্য এ মতবাদ দুটি মৌলিক ধারণার উপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়েছে। প্রথমটি হলো — জগতের অন্তঃস্থিত জীবন প্রক্রিয়া ও তাদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক অর্ন্তদৃষ্টি। এই অর্ন্তদৃষ্টি এমন যে তা মানবকেন্দ্রিকতার স্থলে সামগ্রিকতাবাদকে গ্রহণ করেছে জগতকে দেখার উপায় হিসেবে। অন্যদিকে, মানুষ ঈশ্বরের কতোটা পছন্দমাফিক নির্বাচন, কিংবা মানুষ ঈশ্বরের প্রতিকৃতিতে সৃষ্ট কি-না, মানুষের জীবন ঈশ্বরের প্রতিদান কি-না — এসব ভাবনা উক্ত মতবাদে গৌণ করে দেখা হয়েছে। উক্ত মতবাদের লক্ষ্য হলো : প্রাকৃতিক জগত ও মহাবিশ্ব জুড়ে জীবনের জটিল যে জাল এর মধ্যে বিদ্যমান অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচন করা। এ মতবাদের দ্বিতীয় উপাদানটি হলো : প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের আত্মোপলব্ধির (self-realization)

ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করা। আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে সম্ভব জীবনের জটিল জালের মধ্যে অন্তর্নিহিত ব্যক্তি আত্মা ও প্রতিবেশগত আত্মার সম্পর্ক ও এর অবস্থান সনাক্তকরণ (identification) করা।

উপর্যুক্ত দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতের পাশাপাশি প্রাথমিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বহুমুখী দর্শন, ধর্মীয় ভাবধারা, ও প্রতিবেশবাদী চিন্তাকে অন্তর্গত করা হয়েছে নিবিড় প্রতিবেশবাদের প্রাথমিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায়। এ মতবাদের বহুত্ববাদী দিক সম্পর্কে জিমারম্যানও বলেন, বিভিন্ন দার্শনিক ধারার সমাহারে গঠিত পরিবেশবাদী দর্শন হলো নিবিড় প্রতিবেশবাদ (Zimmerman, 1993, p.161)। এ মতবাদের উৎস বহুমুখী। এর বহুমুখী প্রভাব প্রসঙ্গে সেশনও বলেন, নিবিড় প্রতিবেশবাদের দার্শনিক উৎস হলো হেনরি ডেভিড থোরিউ, জন ম্যুর, ডি.এইচ. লরেন্স, জেফারসন ও এলডাস হাক্সলি (Sessions, 1995, p.*ix*)। আর প্রাচ্যের ধর্ম ও দার্শনিক প্রভাবের মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, গীতা ও গান্ধীর দর্শন। ভারভাইক ফক্সও (Fox, 1995) এরকমটি দাবি করেছেন। তিনি বলছেন, নিবিড় প্রতিবেশবাদ যে বৈশিষ্ট্যকে প্রতিপাদন করে তা নায়েসের জীবন দর্শনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ (Fox, 1995, p.145)। নায়েস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন — "প্রকৃতি সম্পর্কে *হ্যাঁ* বলার ধরনটিই আমার দর্শনের কেন্দ্র।" প্রশ্ন হলো এই *হ্যাঁ* বলতে নায়েস কি বুঝিয়েছেন? সরাসরি এর উত্তর প্রদান করা খুবই দুর্বোধ্য ও কঠিন।

উপর্যুক্ত প্রসঙ্গে নায়েস মনে করেন, *নিবিড়* হলো শর্তনিরপেক্ষ একটি অবস্থা। এ অবস্থাটি আমাদের দেখায় — প্রকৃতিকে হিংস্র ভাবার কোনো কারণ নেই। কেবল মানব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রকৃতিতে লক্ষ করা যাবে হিংস্রতা, দুঃখ ও যন্ত্রণা। অথচ প্রকৃতি হলো সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের আধার। সূর্যের যে হলুদাভ অংশ আমরা দেখতে পাই, পাহাড়ের অপর প্রান্ত থেকে তার গায়ে এসে পড়ছে তা কতোই না সুন্দর, অপূর্ব। এই সুন্দরই বলে দেয় — পরিবেশ সম্পর্কে নিবিড় পাঠ ও অনুধ্যান উভয়ই প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুধ্যানের মাধ্যমে উক্ত জীবনদর্শন অর্জন করেছেন নায়েস। জীবনদর্শনের আলোকেই সম্ভব এর সম্পর্কে আত্মোপলব্ধি অর্জন করা। এই আত্মোপলব্ধি আমাদের আত্মা, পরিবার, কিংবা নিকটজন অপেক্ষা উদ্ভিদ, অ-মানব প্রাণী তথা গোটা পরিবেশকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে এই উপলব্ধি আমাদেরকে মননের দিক থেকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। প্রকৃতির প্রতি সংবেদনশীল ও সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করে। এই সচেতনতাই প্রকৃতিকে অনুধাবন করতে সাহায্য করে। আমাদের আচরণকে সঙ্গতিপূর্ণ করার পাশাপাশি বিজ্ঞানের জ্ঞানকেও যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়। এ নির্দেশনা আমাদের শিখিয়ে দেয় যে, প্রাকৃতিক জগত ও জীবনের কল্যাণ ভাবনা উভয়ই জরুরি। এই ভাবনার কারণেই আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয় যা গোটা গ্রহের ক্ষতির কারণ হতে পারে। আমাদের বসবাসকারী গ্রহের ক্ষতি করার অর্থ হলো খেয়ালের বশে শরীর থেকে আঙ্গুল কেটে ফেলার সঙ্গে তুলনীয়।

নিবিড় প্রতিবেশবাদের বিকাশে বিজ্ঞানের জ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মতত্ত্বের ভূমিকা রয়েছে। এ সম্পর্কিত জ্ঞানের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন লিন হোয়াইটের পরিবেশবাদী ইতিহাসের জ্ঞান থেকে। আমরা যদি লিন হোয়াইটের "The Historical Roots of Our Ecological Crisis" (White, 1967) প্রবন্ধটি লক্ষ করি তাহলে দেখব তিনি মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে পরিবেশ সংকটের মূল উৎস হিসেবে দাবি করেছেন। নিবিড় প্রতিবেশবাদও পরিবেশ সংকটের কারণ হিসেবে এই উৎসটিকে দায়ী করেছে। হোয়াইট দেখিয়েছেন — পরিবেশ সংকটের মানবকেন্দ্রিক উৎসের আদি ও প্রধান অভিযুক্ত ক্ষেত্র হলো ধর্ম, বিশেষ করে খ্রিস্টধর্ম। হোয়াইট বলছেন, "পাশ্চাত্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত খ্রিস্টধর্ম হলো এ যাবৎ দেখা সবথেকে মানবকেন্দ্রিক ধর্ম। এ ধর্ম মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে শুধু দ্বৈত সম্পর্কই সৃষ্টি করেনি, বরং দাবি করছি যে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় হলো — মানুষ তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রকৃতিকে শোষণ করতে পারবে" (White, 1967 :250)। তবে তিনি পুরোপুরোভাবে খ্রিস্টধর্মকে পরিহার করেননি। হোয়াইটের যে দাবিটি নিবিড় প্রতিবেশবাদ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে তা হলো — "পরিবেশ সংকটের উৎস যেহেতু ধর্ম, সেহেতু এর প্রতিকারের জন্য অপরিহার্যভাবে নতুন কোনো ধর্মের অনুসন্ধান করতে হবে" (White, 1967, p.254)। হোয়াইটের এরকম অনুসন্ধিৎসু মন্তব্য পরিবেশবাদী আন্দোলনের জন্য ধর্মকে অভিবাদন জানিয়েছে হয়েছে। নায়েস (Naess, 2000) ও সেশন (Session, 1995) দু'জনই মনে করেন, নিবিড় প্রতিবেশেবাদের ধমীর্য় ও দার্শনিক ভিত্তির উদ্দীপনাটি এখান থেকেই আহরিত। এজন্য লক্ষ করা যায় — নিবিড় প্রতিবেশবাদের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় ধারার অনুষঙ্গ খুবই নিবিড়। তবে এ মতবাদের গোটা ভাবপ্রবণতাটি বৌদ্ধধর্ম ও তাওবাদ দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত।

নিবিড় প্রতিবেশবাদ প্রসঙ্গে নায়েস যেধারাটির প্রস্তাব করেছেন তা ইকোসফি-টি হিসেবে পরিচিত। এ সম্পর্কে জানার পূর্বে আমরা নিবিড় প্রতিবেশবাদের প্রাথমিক ধারণা জেনে নিতে পারি। উক্ত মতবাদের ভিত্তি হিসেবে আটটি মৌলিক সূত্র উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। আমাদের চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে ভাবনার জন্য এই আটটি নীতি সহযোগী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রসঙ্গে নীতিগুলো উল্লেখ করা হলো (Sessions, 1995, p. 68) :

১. পৃথিবীতে প্রতিটি মানবীয় ও অ-মানবীয় সত্তার জীবনের স্বতঃমূল্য (*value in themselves*) রয়েছে। এই মূল্যই তাদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। এই মূল্যকে কখনো সহজাত মূল্য (*inherent worth)*, আবার কখনোবা অন্তর্নিহিত মূল্য (*intrinsic value*) বলা হয়ে থাকে। মানুষের উপকারে আসে, লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয় একারণে নয়, বরং লাভ বা লক্ষ্য নিরপেক্ষভাবে অ-মানব জগতের এইসব মূল্য রয়েছে।

২. প্রাণের বহুমুখী ধারায় যে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য রয়েছে তাই এর স্বনিহিত মূল্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে থাকে।

৩. জীবন বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক প্রয়োজন ব্যতিরেক এই প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্যকে হ্রাস করার কোনো অধিকার মানুষের নেই।

৪. মানব জীবন ও তার সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে জনসংখ্যার বাস্তবসম্মত হ্রাসের ধারণা সঙ্গতিপূর্ণ। অ-মানব প্রাণীর জীবনের বিকাশের জন্যও জনসংখ্যা হ্রাস করা প্রয়োজন।

৫. অ-মানব জগতের উপর বর্তমান মানবীয় হস্তক্ষেপ মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে সংঘটিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে।

৬. আমাদের নীতিনির্ধারণী কৌশলের পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। নীতিনির্ধারণী কৌশলসমূহ অনেকসময়ই আমাদের মৌলিক অর্থনীতি, প্রযুক্তিগত কাঠামোকেও প্রভাবিত করে থাকে। এর ফলাফলের হার বা মাত্রা বর্তমানের চেয়েও আলাদা ও ভিন্ন।

৭. ক্রমবর্ধমান উচ্চমানের জীবন যাপনে দৃঢ়সংকল্প থাকার চেয়ে যেকোনো আদর্শিক পরিবর্তন জীবনের গুণগত মানকে উৎসাহিত করে থাকে। এর ফলে কোনটি বৃহৎ কলেবরের পরিবর্তন, আর কোনটি মহৎ — এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য দাঁড় করানোর নিগূঢ় সচেতনতা সৃষ্টি করে।

৮. উপর্যুক্ত নীতিকে যারা স্বীকার করেন তাদের অবশ্যই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এসব অপরিহার্য পরিবর্তনসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ।

নিবিড় প্রতিবেশবাদের প্রথম নীতিটি দাবি করছে যে, প্রত্যেকটি প্রাণবন্ত সত্তা (living beings) মানব কিংবা অ-মানব উভয়েরই সহজাত মূল্য (inherent value) ও নিজস্বতা (ownness) রয়েছে। প্রত্যেক সত্তার সহজাত মূল্য থাকার অর্থ হলো এদের বেঁচে থাকার ও বিকশিত হবার অধিকার রয়েছে। একারণে প্রাণবন্ত সত্তার অস্তিত্বশীল হওয়া ও নিজস্ব পরিপূর্ণতা নিয়ে বেড়ে উঠবার ক্ষেত্রে কোনো বাধা দেওয়া উচিত নয়। প্রতিটি প্রাণবন্ত সত্তার স্বকীয়তা রয়েছে, এ অর্থে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই স্বকীয়তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার কারণে প্রাণবন্ত সত্তা শুধু মানুষের প্রয়োজন মেটানোর শর্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। এসব বিবেচনা থেকে বলা যায় — নিবিড় প্রতিবেশবাদ প্রতিবেশকেন্দ্রিক মতবাদ (ecocentrism)। এ মতবাদ কোনোভাবেই মানবকেন্দ্রিক নয়। পরিবেশের অ-প্রাণবন্ত সত্তা (non-living being) ও প্রাণবন্ত সত্তার (living being) মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তাও এ মতবাদ স্বীকার করে নিয়েছে। নিবিড় প্রতিবেশবাদী আর্ন নায়েস বলছেন, অ-প্রাণবন্ত সত্তার অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা হলো জলজ উপাদান, ভূমি ও বাস্তুসংস্থান। এদেরকে কোনোভাবেই অবহেলা করা যাবে না। নিজস্ব মূল্যের কারণেই এদের গুরুত্ব রয়েছে, অধিকার রয়েছে টিকে থাকার।

দ্বিতীয় নীতিটি দাবি করছে যে, প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানেরই নিজস্ব মূল্য রয়েছে। জগতের জীববৈচিত্র্য রয়েছে যাতে প্রত্যেকটি উপাদানই পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ।

তবে অস্তিত্বশীল প্রাণবন্ত সত্তার কোনোটিই উচ্চানুক্রমিক সম্পর্কে আবদ্ধ নয়। এদের সম্পর্ক হলো সমতাভিত্তিক। পরিবেশের প্রতিটি সত্তাই অন্যটির উপর কোনো না কোনোভাবে নির্ভরশীল। জীবনের যে প্রবাহ, এই প্রবাহে কোনোটা থেকে অন্যটি ছোট বা বড় নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নিবিড় প্রতিবেশবাদ মানুষের প্রতি ইঙ্গিত করে বলছে যে, পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ককে বুঝতে হবে। নায়েস এ সম্পর্ককে দেখিয়েছেন এইভাবে — ক ও খ এর মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক রয়েছে। অন্তর্নিহিত মূল্যের মৌলিক বিধিবদ্ধ নিয়ম বা সংজ্ঞার মধ্যেই শর্তটি নিহিত। আর যদি এদের মধ্যে সম্পর্ক না থাকে, তাহলে তাদেরকে একই জিনিষ হিসেবে বোঝা সম্ভব নয় (Sessions, 1998, p.151)। পরিবেশ-প্রকৃতির মধ্যে যে সম্পর্ক অবশ্যই তা প্রাণের সমৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্যের বিকাশেই অবদান রেখে থাকে। প্রাণের এই প্রবাহ অন্য কোনো সত্তার অন্তর্ভুক্তিতে বাধা নয়, বরং এদের যে সৌন্দর্য ও সাংগাঠনিকতা প্রত্যেকটি উপাদানই ধারণ করে থাকে।

নিবিড় প্রতিবেশবাদের মৌলিক দাবিগুলোকে সংক্ষেপে কয়েকটি শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা যায় : মতবাদটি প্রথমেই জোরালো অবস্থান নিয়েছে মানবকেন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষার বিরুদ্ধে। এরকম অবস্থানের দার্শনিক ভিত্তি হলো — প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের মধ্যে বিদ্যমান আন্তঃসম্পর্কের ধারণা। প্রকৃতির মধ্যে এই সম্বন্ধমূলক (relational) সম্পর্ককে তিনি দেখেছেন *সামগ্রিক ক্ষেত্র প্রতিমূর্তি*র (total field image) দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রকারান্তরে, এই মতবাদ প্রজাতিবাদ ও মানবকেন্দ্রিকতাবাদী সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণকে বর্জন করেছে। বিপরীতক্রমে, প্রাধান্য দিয়েছে জীবমণ্ডলগত সমতাবাদের (biospherical egalitarianism) উপর। আলোচনার সুবিধার্থে উক্ত মতবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে :

প্রথমত, প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের নিজস্ব মূল্য রয়েছে। এই মূল্যের কারণে তাদের যেমন বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে, তেমনি স্ব-স্ব নিয়মে বিকশিত হবারও অধিকার আছে। আর প্রাকৃতিক পরিবেশ হলো অখণ্ড-সমগ্র, যেখানে প্রতিটি উপাদান পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। নিবিড় প্রতিবেশবাদীদের এই অবস্থানটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও মিথোজীবিতাকে (diversity and symbiosis) স্বীকার করার মধ্যে।

দ্বিতীয়ত, এ মতবাদ মনে করে — প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে প্রাণ-প্রাচুর্য্য। এই প্রাচুর্য্য ইঙ্গিত করছে যে, নিজেদের যেমন বাঁচতে হবে, অন্যদের বাঁচার শর্তকেও উৎসাহিত করতে হবে। উক্ত আদর্শের উপর ভিত্তি করে নিবিড় প্রতিবেশবাদ একটি নীতি দাঁড় করিয়েছে — "বাঁচো ও বাঁচতে দাও"। অন্যদিকে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ককে দেখেছে ক্রমান্বয়িক ও অসমতাবাদী অবস্থান থেকে। এ মতবাদে মানুষের অবস্থান হলো সর্বোচ্চ স্তরে। প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ নির্ভও করে মানুষের ইচ্ছাখুশীর উপর। এই মনোবৃত্তির কারণে মানবকেন্দ্রিক নীতিটি হলো — "হয় তুমি, নয়তো আমি"। এরকম ভাবনা মানুষ ও প্রকৃতিকে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড় করিয়ে

দেয়। অন্যদিকে নিবিড় প্রতিবেশবাদ জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার প্রশ্নে আধিপত্য বিস্তার অপেক্ষা পারস্পরিক মিথোজীবিতার স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। এই স্বীকৃতি প্রকৃতির প্রাণ-প্রাচুর্য্যের উত্তরোত্তর বিকাশকে উৎসাহিত করে থাকে। এ মতবাদের ধারার সুস্পষ্ট প্রতিনিধি হলো ইকোসফি-টি। পরবর্তী অনুচ্ছেদে ইকোসফি-টি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া হল।

২.১ *ইকোসফি-টি প্রসঙ্গে আর্ন নায়েস*

নিবিড় প্রতিবেশেবাদের দার্শনিক প্রাণ হলো ইকোসফি-টি। আর্ন নায়েস (Naess, 2000) মতবাদের প্রবক্তা। ইকোসফি-টি প্রসঙ্গে নায়েস বলেন, নিবিড় প্রতিবেশবাদের সকল মূল্য ও বিকাশের পন্থার সঙ্গে আমরা একমত নাও হতে পারি। তবে এ মতবাদটি ইকোসফি-ক, ইকোসফি-খ, ইকোসফি-গ হিসেবে থাকতে পারে, যা নিজস্ব অভিমতের আলোকে বিকশিত হয়ে থাকে। স্বকীয়তা বজায় রেখে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিষয়ক দর্শন প্রণয়ন করা যেতে পারে। ইকোসফি-টি এর আলোকে ব্যক্তি তার নিজের দর্শনকে খোঁজে নিতে পারেন। তবে "ইকোসফি-ক, ইকোসফি-খ, বা ইকোসফি-গ যেটাই আপনি প্রণয়ন করুন না কেন এটা বলার সুযোগ নেই যে, "তা একান্তই আপনার নিজস্ব" বা আপনার দ্বারা সৃষ্ট 'মৌলিক গবেষণা'। ইকোসফি-টি এমন এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যাতে একজন তার ঘরে বসেই দার্শনিকভাবে এর মধ্যে অবস্থান করতে পারেন" (Naess, 1989, p.37)।

উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে বলা যায় — জীবন সম্পর্কে ব্যক্তিগত দার্শনিকভাবনা বা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কিভাবে পরিবেশগত সমন্বয় ও প্রজ্ঞা (ecological harmony and wisdom) অর্জনে কাজে লাগানো যায় তা দেখানোই ইকোসফি-টি'র লক্ষ্য। একে নায়েস নামকরণ করেছেন ইকোসফি হিসেবে, যা ইকোস (ecos) (বাস্তু) বা প্রতিবেশ, সোফিয়া (sophia) হলো প্রজ্ঞা। ইকোসফি মূলত এ দু'য়ের সমন্বয়ে গঠিত। ইকোসফি মূলত প্রতিবেশগত প্রজ্ঞাকে বোঝায়। নায়েসে বিশ্বাস করতেন — এ প্রজ্ঞার কারণে একজন পরিপূর্ণ মানুষ জানেন তার নিজস্ব জীবনদর্শন কি হবে, কিসের পক্ষে তিনি অবস্থান নিবেন, আর কোনটিকে তিনি অগ্রাধিকার দিবেন। এসব ভাবনা নিয়েই ইকোসফি-টি'র বিকাশ।

পূর্বেও উল্লেখ করেছি বিভিন্ন দার্শনিক ভাবনার আলোকে ইকোসফি-টি'র বিকাশ হয়েছে। তবে প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে রয়েছে *আত্মোপলব্ধি* (Self-Realization)। আত্মোপলব্ধিকে তিনি আবার *উপলব্ধিমূলক প্রতিবেশগত আত্মা* (comprehensive ecological self) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। *উপলব্ধিমূলক প্রতিবেশগত-আত্মা* সংকীর্ণ *ব্যক্তি-আত্মা* থেকে আলাদা, বিপরীত ও উন্নততর। প্রশ্ন হলো ব্যক্তি-আত্মাকে কীভাবে *উপলব্ধিমূলক প্রতিবেশগত-আত্মায়* পরিণত করা যায়? নায়েস বলছেন, সনাক্তকরণের (identification) মাধ্যমে আমরা নিজেদের আত্মাকে প্রসারণ করতে পারি। নিজেদের

সম্পৃক্ত করতে পারি সমগ্র প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে। অনেকটা রবিঠাকুর ভাষায় — "আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ/ তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান/"। আমি-সত্তার স্থান এ বিশ্বভরা প্রানের মাঝে। এই সনাক্তকরণের আদর্শই হলো অন্তর্নিহিত মূল্যের (intrinsic value) ভিত্তি। সবমিলিয়ে বলা যায় — ইকোসফি-টি কতোগুলো মৌলিক ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত: আত্মোপলব্ধি (self-realization), প্রতিবেশগত আত্মা (ecological self) ও সনাক্তকরণ (identification)। নিবিড় প্রতিবেশবাদ বোঝার জন্য উপর্যুক্ত ধারণাসমূহ স্পষ্ট করা যেতে পারে :

ক. আত্মোপলব্ধি (self-realization). আত্মোপলব্ধি শব্দটি নরওয়েজিয়ান *Selv-realisering* এর সঙ্গে তুলনীয়। এটি এক সক্রিয় অবস্থা ও শর্ত। নায়েস এ ধারণাটি দ্বারা কোনো স্থান বা বাস্তুসংস্থানকে বোঝাননি যেখানে ব্যক্তি পৌঁছুতে পারে, বা অবস্থান করতে পারে। তিনি মনে করেন, কেউই আত্মোপলব্ধির স্তরে উপনীত হতে পারে না। সকলকিছুকে উপলব্ধি করার জন্য পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধির প্রয়োজন রয়েছে। বৌদ্ধধর্মে ব্যক্তি যেভাবে নির্বাণ স্তরে পৌছুঁতে পারে না, ঠিক ব্যক্তিও পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধি লাভ করতে পারে না। তবে ব্যক্তির জীবন যাপনের জন্য এটি একটি প্রক্রিয়া যা তাকে গন্তব্যের দিকে নিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রশ্ন হলো নায়েস কেন এরকম একটি আদর্শকে দার্শনিক পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছেন? জীবনের জন্য, জীবন ধারণের জন্য কিছু অনিবার্য বিষয় রয়েছে। এ বিষয়সমূহের সুনির্দিষ্ট তীর (arrow) বা নির্দেশক রেখা (direction) রয়েছে যা আত্মা থেকে বৃহত্তর আত্মার দিকে অভিমুখিতাকে বোঝায়। এ অভিমুখিতা অনেকটা ভেক্টরের (vector) মতো (Reed and Rothenberg, 1987)। তীর, নির্দেশক রেখা বা অভিমুখী রেখা ও ভেক্টর সবই রূপক। এসবেরই অর্থ হলো ব্যক্তির আত্মোপলব্ধিকে প্রসারিত করা। সকল প্রাণবন্ত সত্তার জন্য আত্মোপলব্ধি প্রযোজ্য। আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে ব্যক্তি আত্মাকে উপলব্ধিমূলক প্রতিবেশগত আত্মায় উন্নীত করা যায়।

খ. **প্রতিবেশগত আত্মা** (ecological self). প্রকৃতির প্রাণবন্ত অবস্থাটিই হলো এর পরিপক্বতা (maturity)। পরিপক্ব আত্মা (mature self) প্রথাগত আত্মার ধারণা থেকে ভিন্ন। তবে এ আত্মা প্রকৃতিকে উপলব্ধি করতে পারে। উপলব্ধিজাত এই পরিপক্ব আত্মাকেই নায়েস উল্লেখ করেছেন প্রতিবেশগত আত্মা (ecological self) হিসেবে। নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে সনাক্তকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি আত্মাকে প্রসারণ ঘটানো যায়। এই প্রসারণের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে সনাক্ত করে থাকে।

নায়েসের ইকোসফির মূলকথা হলো — প্রতিবেশগত আত্মার বিকাশকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে প্রকৃতি ও আত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা। প্রতিবেশগত দিক থেকে

সচেতন আত্মাই হলো *প্রতিবেশগত আত্মা*। এ আত্মার মধ্যে ব্যক্তি তার নিজেকে অনুসন্ধান করে নিতে পারে (Naess, 1995, p. 226)। এ ধারার আত্মার মধ্যে ব্যক্তি যখন তার নিজেকে সনাক্ত করতে পারে তখন ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে প্রতিবেশগত আত্মা অবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাঁর মতে, প্রতিবেশগত আত্মা তাৎক্ষণিকভাবে বিকশিত হয় না। এর একটি বিকাশমান ধারা রয়েছে। বিকাশের এই ধারাটি ব্যক্তি আত্মা থেকে সামাজিক আত্মা, সামাজিক আত্মা থেকে অধিবিদ্যক আত্মার দিকে অভিমুখিতাকে বোঝায়। উক্ত দার্শনিক জ্ঞানের অনুসরণে তিনি বলেন, "জীবন হলো মৌলিকভাবে এক", আর জীবমণ্ডল হলো " জীবন-কাঠামো (form of life)"। এ জীবন কাঠামোকে বোঝা যায় উপলব্ধি ও সচেতনতা দ্বারা। সর্বোপরি প্রকৃতির প্রতি 'সচেতনতা'র বিষয়ে তিনি কখনোই বিস্মৃত হননি। প্রাকৃতিক উপাদানের প্রতি সজাগ হওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি এই সচেতনতা অর্জন করতে পারেন। ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিসত্তার বিশেষ প্রকাশের মাধ্যমে *প্রতিবেশগত আত্মা* গঠিত হয়ে থাকে। এটি সম্পূর্ণভাবে সামাজিকভাবে গঠিত ব্যক্তিসত্তা থেকে আলাদা। এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো অনুষঙ্গজাত অ-সংবেদনশীলতা (context-insensitive), অ-অবেগজাত (unemotional) ও একইসঙ্গে প্রতিবেশের প্রতি বৌদ্ধিক (rational) মনোভাব পোষণ করা।

প্রতিবেশগত প্রজ্ঞা, প্রতিবেশগত ঐক্য ও ভারসাম্য উভয়ের প্রতিই দৃষ্টি দিয়ে থাকে। এখানে দর্শন হলো প্রজ্ঞা তথা জ্ঞানেরই ধারা। এ জ্ঞান প্রকৃষ্ট অর্থে আদর্শনিষ্ঠ (normative)। আদর্শনিষ্ঠ হবার কারণে এর মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে আদর্শ, নিয়ম, স্বীকার্য সত্য, মূল্য অগ্রাধিকার ও আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কিত প্রাকল্পিক ভাবনা। দূষণ সম্পর্কে কার্যকারণিক বিশ্লেষণ, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ক্রমান্বয়িক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘটনা বা তথ্য উপাত্তই শুধু আমাদেরকে ইকোসফি অভিমুখী করবে তা নয়। বরং মূল্য অগ্রাধিকার দেবার বিষয়টিও এখানে রয়েছে (Naess, 1973, Drengson & Inoue, 1995, p.8)। নায়েস বলতে চাচ্ছেন — প্রতি ব্যক্তির ইকোসফির নামকরণ ভিন্ন হতে পারে। যে স্থানে, অথবা যে মূল্যবোধের সঙ্গে ব্যক্তির জোরালো সম্পৃক্ততা রয়েছে তার সঙ্গে সমন্বয় করে একেকজনের ইকোসফি একেক নামে হতে পারে। জগতের মধ্যে মানুষ, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে, বৈচিত্র্য রয়েছে। এসবই বহুত্বের প্রকাশ। ঠিক একইভাবে নিবিড় প্রতিবেশেবাদের সমর্থনে ইকোসফিরও আধিক্য বা প্রাচুর্য থাকতে পারে। যেমন, নায়েস তাঁর ইকোসফিকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন *ইকোসফি-টি* হিসেবে। অন্য কেউ একে *ইকোসফি-চ* বা *ইকোসফি-গ*, বা *ইকোসফি-ছ* হিসেবে উল্লেখ করতে পারেন। সর্বোপরি প্রতিবেশ নিয়ে দর্শনই হলো ইকোসফি, তাতে প্রত্যেক কমিউনিটি বা ব্যক্তির জীবন দর্শনের ইতিহাসও থাকতে পারে, আলাদাভাবে। তিনি ইকোসফির ধারণাকে ব্যবহার করেছেন প্রতিবেশগত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যক্তিগত দর্শন হিসেবে।

আত্মোপলব্ধি (self-realization) হলো *ইকোসফি-টি* এর একমাত্র ও প্রধান আদর্শ। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ইকোসফি হতে পারে একটি ব্যক্তিগত জীবন দর্শনের বিষয় আশয় যাকে দু'ধরনের অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করা যায় (Naess, 1990, p.197; Naess, 2000) :

ক. জগতের প্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণা বা বাক্যকে আদি প্রকল্প H হিসেবে।

খ. জগতের আদি মূল্যবোধ যাকে আদর্শ N হিসেবে নামোল্লেখ করা যায়।

আদর্শ-১ (N1) প্রাথমিক আদর্শ : আত্মোপলব্ধি

প্রকল্প.১ (H1) : প্রকৃতির উপাদানসমূহ যতোই উচুঁস্তরের হোক না কেন তা যে কোনো ব্যক্তিই অর্জন করতে পারবেন। গভীর অনুসন্ধানী বা সনাক্তকারী বিষয়াদি অথবা অন্য যেকোনো কিছুই এর সঙ্গে সম্পর্কিত থাকুক না কেন কেবল ব্যক্তি-মানুষই পারবে বুঝতে বা জানতে।

প্রকল্প.২ (H2): যতোই উচুঁ পর্যায়ের আত্মোপলব্ধি ব্যক্তি অর্জন করুক, এর পরবর্তী উন্নতি বা বিকাশ অন্যদের আত্মোপলব্ধির উপর নির্ভরশীল।

প্রকল্প.৩ (H3): যে কারোরই পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধি সকলের উপরই নির্ভর করে।

প্রাথমিক আদর্শ -২ (N2): সকল প্রাণবন্ত সত্তার জন্য আত্মোপলব্ধি জরুরি।

জগত সম্পর্কিত প্রাকল্পিক ও প্রাথমিক আদর্শের আরো কয়েকটি ধাপ প্রসঙ্গে নায়েস বলছেন (Naess, 2000, p. 199) :

প্রকল্প.৪ (H4): জগতে জীবনের বৈচিত্র্য আত্মোপলব্ধির সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করে।

প্রাথমিক আদর্শ -৩ (N3) : জীবনের বৈচিত্র্য রয়েছে।

প্রকল্প.৫ (H5) : জীবনের জটিলতা আত্মোপলব্ধির সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

প্রাথমিক আদর্শ -৪ (N4): সুতরাং, সবকিছুর মধ্যেই এই জটিলতা রয়েছে।

প্রকল্প.৬ (H6): জগতে জীবনসমৃদ্ধ উপাদানের পরিমাণ সীমিত।

প্রকল্প.৭ (H7) : জগতের সীমিত সম্পদের অধীনে কেবল মিথোজীবিতাই (symbiosis) পারে আত্মোপলব্ধির সর্বোচ্চকরণ করতে।

প্রাথমিক আদর্শ (N5) : মিথোজীবিতাকে স্বীকার করতে হবে।

উপর্যুক্ত পাঁচটি প্রাথমিক আদর্শের সঙ্গে জগত-প্রকৃতি সম্পর্কিত সাতটি প্রকল্প সমন্বিত হয়ে আত্মোপলব্ধির এক ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত নির্মিত হয়েছে। তিনি মনে করেছেন, জীবনের বৈচিত্র্য ও মিথোজীবিতা জগতের সঙ্গে মানুষের সমভাবাপন্ন সম্পর্ককেই ইঙ্গিত করে। এসবের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে আত্মোপলব্ধির প্রতিবেশগত পরিপ্রেক্ষিত। বিষয়টি আরেকটু স্পষ্ট করার জন্য আমরা আত্মোপলব্ধি ধারণাকে স্পষ্ট করতে পারি।

আত্মোপলব্ধি বলতে নায়েস বুঝিয়েছেন, “নিজস্ব সত্তায় স্থির বা অটল থাকবার অবিরত প্রচেষ্টাকে” যা একজনের অভিজ্ঞতাকে পরিবেশ সম্পর্কিত ভাবনায় উন্নীত হতে পারে। সর্বোপরি বলা যায় — এ হলো এক বিকাশ যা আত্মস্বার্থকে অতিক্রম করে এবং যেকোনো সত্তার সৃজনশীল বিবর্তনকে প্রতিপাদন করে (Naess 2000, pp. 85, 166)। তবে অন্য কোনোকিছু দিয়ে আত্মোপলব্ধি সীমিত বা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় — অ-মানব প্রাণীর অস্তিত্বের জন্য অন্য সকল অ-মানব প্রাণীর উপর বা প্রাণবন্ত সত্তার উপর নির্ভর করতে হয়। কৃষিকাজ করতে গিয়ে কৃষক অনেক কীট-পতঙ্গ বা প্রাণ নিহত করে থাকেন। কোনো জাতি তার টিকে থাকার নামে অন্য জাতির সঙ্গে যুদ্ধ লিপ্ত হতে পারেন। উভয় দৃষ্টান্তে প্রাণ হরণ মূখ্য প্রতিপাদ্য। এরকম অসংখ্য বিরুদ্ধ-উদাহরণ রয়েছে যা আত্মোপলব্ধির অন্তরায়। এ প্রসঙ্গে নায়েসের ভাবনা জেনে নিতে পারি। তিনি বলছেন, ব্যক্তির প্রয়োজন ও কামনা অনুসারে জীবনের সকল প্রকরণই এক ও মৌলিক। উক্ত ধারণার সম্ভাব্য সকল আপত্তি নিরসনের জন্য নায়েস আত্মোপলব্ধির কতোগুলো বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণের কথা বলেছেন (Naess, 2000, Introduction, p. 9) :

১. আত্মোপলব্ধি কখনোই আত্মকেন্দ্রিক নয়। মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তি-আত্মা কখনোই বৃহত্তর আত্মায় বিলীন হয়ে যায় না। ভিন্ন ভিন্ন সত্তার (মানুষসহ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রেখেই বৃহত্তর আত্মার স্বরূপ গঠনে ব্যক্তি-আত্মা অংশগ্রহণ করে থাকে মাত্র। আমরা কখনোই অভীষ্ট লাভের লক্ষ্যে পরিবেশের মধ্যকার ঐকীকরণকে বিশ্লিষ্ট করতে পারি না। এই ঐকিক ধারণা থেকে তিনি ‘বৃহত্তর আত্মার’ (greater Self) ধারণায় উপনীত হয়েছেন। এ ধারণাটি ব্যক্তি ও প্রকৃতি উভয়ের বিকাশের জন্য প্রয়োজন। আর বৃহত্তর আত্মাকে বোঝার জন্য প্রয়োজন আত্মোপলব্ধি ।

২. ব্যক্তি যদি তার নিজের আত্মাকে অন্য ব্যক্তি, বা অন্য কোনো প্রজাতির সদস্য ও প্রকৃতি পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারেন তাহলে আলাদাভাবে পরার্থবাদের (altruism) কোনো প্রয়োজন নেই। আত্মার প্রসারমানতার ধারণা এরকম যে, গোটা প্রাকৃতিক জগতের স্বার্থের সঙ্গে আমাদের নিজেদের স্বার্থ তা একাকার করে নিতে সমর্থ। ঠিক যেকারণে আমরা অন্যের স্বার্থকে উপলব্ধি করছি, একই কারণে আমরা গোটা প্রাকৃতিক জগতের সম্ভাবনাকেও বিকশিত করতে পারব যা আমাদের আত্মোপলব্ধির ধারণাকে বিকশিত করতে সক্ষম।

প্রশ্ন হলো নায়েসের নিবিড় প্রতিবেশবাদে আত্মোপলব্ধির ভূমিকা কী? নায়েস থেকে উদ্বৃত করা যাক — “জীবমণ্ডলের জালে গ্রন্থিবদ্ধ করা অথবা আন্তর্নিহিত সম্পর্কের জালে আবদ্ধ করাই” হলো আত্মোপলব্ধির ভূমিকা (Naess 1973, p.95)। নিবিড় প্রতিবেশবাদী ফক্সও একই দাবি করেছেন। তিনিও বলছেন, মানবসত্তা ও অন্যসব সত্তা সকলেই হলো “একক অ-বদ্ধ সত্তার (single

unfolding reality) পরিপার্শ্ব” (Fox 1995, p. 252)। ব্যক্তি যখন বুঝতে পারে সে গোটা জগত প্রক্রিয়ার অংশ, তখন সে সকল প্রাণবন্ত সত্তার সঙ্গে জগতের এই ঐক্য বা একত্রিতকরণকে (togetherness) উপলব্ধি করতে পারে। এই উপলব্ধির সাহায্যে ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে সনাক্ত করতে পারে। এটি আমাদের প্রলুব্ধ করে অন্যসত্তা থেকে নিজেদের আলাদা কিংবা পৃথক না ভাবতে। কারণ আমরা যদি পরস্পরকে আলাদা ভাবি তাহলে স্বার্থগত দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এসবের ঊর্ধ্বে উঠে আমরা যদি প্রতিটি সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারি, তাহলে তাদের সাধারণ স্বার্থকেও বুঝতে পারব। এই উপলব্ধিই আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে অন্যসব সত্তাও বাঁচতে চায় (Naess, 2000, p. 172, 175; Fox, 1995, p.105)। তবে স্বার্থগত দ্বন্দ্ব দূর না হলেও *সনাক্তকরণ* আমাদেরকে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে থাকে। কোনো কারণে যদি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, কোনো প্রাণবন্ত সত্তাকে হত্যা করা হয় তাহলে তার আত্মোপলব্ধি বাধাগ্রস্ত হবে। যেমন, খাদ্য প্রস্তুতের জন্য, কিংবা কোনো খাদ্য শস্য রক্ষার জন্য কীট-পতঙ্গ নষ্ট করা হয় তাহলে যে কেউই এর প্রতি বিশেষ ইতিবাচক অনুভূতি প্রদর্শন করবেন না। প্রকৃতি সম্পর্কিত আত্মোপলব্ধি নির্মাণের জন্য এখানে নিজেদের পরস্পর অভিন্ন সত্তা ভাববার অনুভূতিটাই যথেষ্ট (Naess 2000, p.176)। নিজেদের পরস্পর অভিন্ন সত্তা ভাবার অর্থই হলো সমতার দিকে যাত্রা। পরিবেশগত উপাদানের অন্তর্নিহিত মূল্যের দাবিতে জীবমণ্ডলগত সমতার (bio-spheric egalitarianism) প্রস্তাব করেছে নিবিড় প্রতিবেশবাদ। প্রশ্ন হলো : এ মতবাদ বিকাশে জীবমণ্ডলগত সমতাবাদের কি কোনো প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে? নাকি অন্য কোনো ধারণার সাহায্যে মতবাদটিকে বোঝা যেতে পারে? পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কিত বিতর্কের কয়েকটি দিক পর্যালোচনা করা হবে।

৩. *জীবমণ্ডলগত-সমতাবাদ, অন্তর্নিহিত মূল্য ও প্রতিবেশগত আত্মা সম্পর্কিত বিতর্ক মূল্যায়ন*

উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদে আমরা প্রতিবেশগত আত্মার বিকাশ ও আত্মোপলব্ধির সঙ্গে প্রতিবেশবাদী আত্মার সম্পর্ক নিয়ে পর্যালোচনা করেছি। এই পর্যালোচনায় যেদিকটি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে তা হলো : *ব্যক্তিক-আত্মা* (individual soul) ও *প্রতিবেশগত আত্মা* (ecological soul) পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনোই বিকশিত হয় না। উভয়ের বিকাশে কিছু আদর্শিক নিয়ম সক্রিয় রয়েছে। এই সক্রিয়তা বোঝার একমাত্র উপায় হলো *আত্মোপলব্ধি*। প্রশ্ন হলো নিবিড় প্রতিবেশবাদ কি এধরনের অনুধ্যানিক ও আদর্শিক প্রকল্পের উপর ভর করে পরিপূর্ণভাবে জীবমণ্ডলগত সমতা অর্জন করতে সক্ষম? কিংবা প্রতিবেশ আত্মা ও এর অন্তর্নিহিত মূল্য সম্পর্কিত বিতর্কের যথাযথ জবাব কি নিবিড় প্রতিবেশবাদ সন্তোষজনকভাবে দিতে পেরেছে? উক্ত অনুচ্ছেদে এরকম কিছু দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হবে।

পরিবেশবাদী ও অ-পরিবেশবাদীদের অনেকেই নিবিড় প্রতিবেশবাদের সমালোচনা করে আসছেন। এ মতবাদের বিরুদ্ধে সবথেকে জোরালো সমালোচনা উত্থাপিত হয়েছে প্রতিবেশ নারীবাদীদের পক্ষ থেকে। প্রতিবেশ নারীবাদীদের সমালোচনার মূখ্য বিষয় হলো — নিবিড় প্রতিবেশবাদ পুরুষের মতো নারীকেও পরিবেশ সংকটের কারণ হিসেবে দায়ী করে থাকে। অন্যদিকে সামাজিক প্রতিবেশবাদীগণ মনে করেন, সমাজের মধ্যেই রয়েছে পরিবেশ সংকটের উপাদান। নিবিড় প্রতিবেশবাদ পরিবেশ সংকটের এই সামাজিক উৎসসমূহ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। এসব মিলিয়ে বলা হয় — এ মতবাদ অতিরিক্ত মাত্রায় রহস্যবাদী, কোথাওবা অবাস্তববাদী, অতিরিক্তমাত্রায় দাবিসর্বস্ব, সংকীর্ণ, অনেকক্ষেত্রে মানব-বিদ্বেষী। নিবিড় প্রতিবেশবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

নিবিড় প্রতিবেশবাদের বিরুদ্ধে জোরালো আপত্তি হলো — এটি অ-অবাস্তব ও স্থির মতাদর্শ। এ মতবাদের পরিভাষার মধ্যেই রয়েছে অ-বাস্তবতা। প্রতিবেশকে *নিবিড়* কোনো ধারণাগত উপাদান ও আত্মোপলব্ধির অধীনস্থ করার ওকালতি করে থাকে এ মতবাদ। এখানে *নিবিড়* (deep) ধারণাটি হলো পরিবেশ-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আন্তঃসম্পর্ক প্রসঙ্গে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, চুলচেরা বিশ্লেষণের অধীনে আনবার প্রয়াস। কিন্তু এই *অধীনতা* কি পরিবেশগত সমগ্রতাবাদকে প্রতিফলন করে। যেভাবেই হোক এই *অধীনে* আনবার বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ ব্যাপার অন্তত দুটি কারণে :

এক. *নিবিড়* ধারণাটি ক্ষুদ্রত্তর অবস্থাকে বৃহৎ পরিসরে আনার কথা বলে যা প্রকারান্তরে অধীনস্থ করার সামিল।

দুই. *নিবিড়* বিশেষণটি প্রতিবেশকে অধীনস্থ করে তাত্ত্বিক বোধ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। এই বোধ সমমাত্রিক হওয়া অপেক্ষা মুখাপেক্ষিতাকে নির্দেশ করে।

তবে উপর্যুক্ত দুটি সমস্যা বাদ দিলে *নিবিড়* প্রতিবেশবাদের একটি ইতিবাচক দিক রয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তিকে অভিন্ন সত্তা হিসেবে ভাববার অনুপ্রেরণা দেয় এ মতবাদ। এবিবেচনায় প্রকৃতি যেমন মানুষের সঙ্গে, তেমনি মানুষ, অ-মানব প্রাণী সবই পরম্পর অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে আবদ্ধ। কেউ কারো অধীনস্থ নয়। কিংবা অধীনস্থ হবার প্রয়োজনও নেই। বরং এর সবই হলো প্রাকৃতিক সমন্বিত প্রক্রিয়া। প্রাকৃতিক সমন্বয়ের সঙ্গে অধীনস্থ হবার বিরোধ রয়েছে। অধীনস্থ হবার অর্থ হলো নিম্নস্তরের সত্তাকে উঁচুস্তরের সত্তা দ্বারা অধীনস্থ করা। আমাদের বুঝতে হবে প্রকৃতিতে কোনোকিছুই অধীনস্থ অবস্থায় নেই। প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ পরিপূর্ণ অর্থে পারম্পরিক সম্পর্কের জালে সন্নিবেশিত। এই জালকে বোঝানোর জন্য তাঁরা *নিবিড় প্রতিবেশবাদ* ধারণাটিকে ব্যবহার করেছেন।

নিবিড় শব্দটির ব্যবহার নিয়ে উত্থাপিত সমালোচনার পাশাপাশি এ মতবাদের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড নিয়েও সমালোচনা রয়েছে। সমালোচনা রয়েছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উদাসীনতা প্রসঙ্গে। নিবিড় প্রতিবেশবাদী নায়েসের মতে, কঠোর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

প্রকৃতির অখণ্ডতাকে অকার্যকর করে দেয়। আমাদের ব্যবহারিক জীবন সাপেক্ষে যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখা যাবে যে, প্রতিনিয়তই আমাদেরকে নির্ভর করতে হয় প্রকৃতির উপর। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবেই প্রাকৃতিক সম্পদকে প্রক্রিয়াজাত করতে হয়। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য এ কর্মকাণ্ড খুবই জরুরি। কিন্তু, এ মতবাদ পরিপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। এই প্রত্যাখ্যান মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে আসে। সর্বোপরি প্রতিবেশগত আচরণ আর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরোধপূর্ণ দিকটি নিবিড় প্রতিবেশবাদ যেভাবে প্রাসঙ্গিক করতে চাইছে তা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। নিবিড় প্রতিবেশবাদের বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগটি যতোটা অর্থনৈতিক কিংবা মানবকেন্দ্রিক, ঠিক সে মাত্রায় পরিবেশসম্মত নয়।

এধরনের অভিযোগের বিরুদ্ধে বলা যায় — অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মানেই এই নয় যে, প্রাকৃতিক সম্পদ উজাড়করণকে নীতি হিসেবে নিতে হবে। তবে বিদ্যমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের লাগামহীন এগিয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক উৎসের উপর মারাত্মক বিপন্নতা সৃষ্টি করছে। সারা পৃথিবী জুড়ে সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার নামে উজাড়করণকেই উৎসাহিত করাছে। এ কারণে আমরা লক্ষ করছি — বৃহৎ কলেবরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একইসঙ্গে বৃহৎ পরিসরের পরিবেশ অ-বান্ধবও। সাম্প্রতিক বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত থেকেও জানতে পারছি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রসমূহ তাদের আয়েসী জীবনের জন্য গ্রীন হাউজ গ্যাস উৎপাদন করছে। অবাধে ধ্বংস করছে প্রাকৃতিক সম্পদ তথা প্রকৃতিকে। বিষিয়ে তুলছে গোটা পৃথিবীর জীবমণ্ডল। সুতরাং, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশগত সংহতি উভয়ের সম্পর্কটা বিরোধপূর্ণ এটাই যুক্তিযুক্ত। ইদানিং উন্নয়ন অভিধায় টেকসই উন্নয়ন পরিভাষাটি নতুন মেজাজে উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করার পরামর্শ দিলেও এর মানবকেন্দ্রিক চরিত্র নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেছেন। এ বিবেচনায় নিবিড় প্রতিবেশবাদ বিশুদ্ধ যে পরিবেশবাদী জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে পরামর্শ করেছে তা বর্তমান ও আগামীদিনের প্রকৃতির সৌহার্দ্য, সমন্বয় ও টিকে থাকার শর্তটিও বিদ্যমান রয়েছে। এদিক থেকে এর ইতিবাচক দিকটিও উল্লেখ করার মতো। নিবিড় প্রতিবেশবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমালোচনাটি অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে গৃহীত যা একান্তই মানবকেন্দ্রিকতাবাদী। এ সমালোচনায় মানুষের স্বার্থ ও উন্নয়ন অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু, পরিবেশবাদের অন্যতম শর্ত হলো এর অন্তস্থিত সকল সদস্যদের সমতা বিধান। বিশেষ কোনো সদস্যকে অতিরিক্ত মাত্রায় গুরুত্ব দেয়া যাবে না, সকল সদস্যই সমান গুরুত্বের দাবি রাখে। নিবিড় প্রতিবেশবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহে পরিবেশবাদের এই সাধারণ সূত্রটি প্রতিফলিত হয়নি।

উপর্যুক্ত সমালোচনার আরেকটি পরিমার্জিত দার্শনিক ভাষ্য লক্ষ করি লেস্টার মিলব্রাথের (Milbrath ,1984, pp. 25-26) আলোচনায়। তিনি নিবিড় প্রতিবেশবাদী

দার্শনিকদের মূল্যায়ন করেছেন অ-কার্যকরী দার্শনিক গোষ্ঠী হিসেবে। অতিশায়িত দার্শনিকতাকে এরকম অভিযোগের পেছনে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, রাজনীতি কিংবা রাজনৈতিক সংস্কারের প্রশ্নে তাঁরা অতোটা স্পষ্ট নন। তাঁরা প্রকৃতি সম্পর্কে যে ভাবনা নির্মাণ করেছেন তা একান্তই ভাবাবেগপ্রসূত ও দার্শনিক জ্ঞানসর্বস্ব। মিলব্রাথ মনে করেন, নিবিড় প্রতিবেশবাদী দার্শনিকদের অনেকেই প্রতি-সাংস্কৃতিক (anti-cultural) বলয়ের বাসিন্দা যাদের জীবন ও সংস্কৃতি একান্তভাবে প্রকৃতিঘেষা, অথবা জীবন যাপনের ধরনই হলো প্রকৃতিবাদী। জীবন যাপনের প্রয়োজনে জীবমণ্ডলকে কম আহত করার পক্ষে। প্রকৃতির সঙ্গে তাদের মিথস্ক্রিয়াও গভীর ও মর্যাদাপূর্ণ ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। এ বিবেচনায় তারা র‍্যাডিকেল ও রক্ষণশীল। এটাও ঠিক তাদের গোত্র, সংস্কৃতি ও পরিবেশসম্মত জীবনধারণ থেকে অন্যরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিখতে সক্ষম।

নিবিড় প্রতিবেশবাদ নানামাত্রিক রূপক, অধিবিদ্যক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষার প্রতি মনোযোগী হলেও পরিবেশগত সমস্যার প্রকৃত উৎস অনুসন্ধানে তাঁরা ব্যর্থ। সামাজিক প্রতিবেশবাদীগণ এদিক থেকে সফল। তাঁরা মনে করেছেন যে, পরিবেশগত সমস্যার মূল উৎস হলো সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক। পরিবেশ সংকটের পরিসর ও এর ঐতিহাসিক উৎসসমূহকে যদি বিবেচনায় আনি তাহলে ভিন্ন চিত্র লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ জ্ঞানসমৃদ্ধ জনগণকে বলতে শুনি — "আমরাই নেতৃত্ব দিচ্ছি"। নেতৃত্ব দেওয়ার অর্থই হলো এর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। পরিবেশ ও মানুষের ইতিহাসের দিকে তাকালেও দেখব প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তারের জন্য বুদ্ধিজীবী সামর্থ্যবান মানুষ সক্রিয় ছিলো। নেতৃত্ব ও সামর্থ্যেও সাহায্যে তাঁরা মানুষ ও প্রকৃতিক উভয়কেই অধীনস্থ করছে। সেই অধীনে আসার উপলক্ষ হিসেবে সম্পদ বা সম্পত্তি ভূমিকা রাখছে। মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ই শোষিত হচ্ছে অধীনস্থ হবার মধ্য দিয়ে। প্রকৃতিকে অধীনস্থ রাখবার নেতৃত্বও দিচ্ছে এই সামর্থ্যবান মানুষ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানুষের নেতৃত্বেই প্রযুক্তিগত উন্নতি ও পদ্ধতিমাফিক শক্তির বিকাশও ঘটছে। এ বিকাশ কোথাও দ্রুতগতিতে, আবার কোথাওবা ধীর।

অধীনস্থ করার মাধ্যমেই বিকাশ ঘটছে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও পরিবেশ নিয়ে উন্নয়নের ভুঁইফোড় আদর্শবাদ। এই উন্নতি ও বিকাশ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারাসাম্যকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করে তুলছে। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে মানুষ যে সম্পদ আহরণ করছে সেই সম্পদের অসম বণ্টনই সামাজিক অসমতা সৃষ্টি করছে। অসমতা সামাজিক শোষণ বঞ্চনার দায় সৃষ্টি করছে। আমাদের সমাজ ও জীবন থেকে আধিপত্য ও শোষণ দূর করতে হলে সমাজ থেকে সম্পদের বণ্টনের ভিত্তিতে গড়ে উঠা বৈষম্যও দূর করতে হবে। এখানেও আমরা লক্ষ করছি : সামাজিক শোষণের ভিত্তিমূলে রয়েছে প্রাকৃতিক শোষণ। এই প্রাকৃতিক শোষণের মূল উৎস কিন্তু সমাজ ও এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় প্রোথিত। আমরা যদি বাজার অর্থনীতির দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে দেখব সেখানে অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা সামাজিক কাঠামো ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এই ভিন্নতা সত্ত্বেও

প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রশ্নে বিভিন্ন সমাজ পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। বস্তুত বাজার অর্থনীতির চরিত্রটিই এরকম। শোষণ ও প্রতিযোগিতা হলো এর প্রাণ। অন্যভাবে বলা যায় : বাজার অর্থনীতির মূল ব্যাকরণটি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দখলদারিত্বের শর্তের উপর নির্ভরশীল। সামাজিক সংকটের এইসব দায় উদঘাটন করতে পারলে পরিবেশ সংকটের স্বরূপ ও এর উৎস বের করাও সহজ হবে। সম্ভব হবে পরিবেশ-বান্ধব নীতিমালা ও জীবনদর্শন নির্মাণ করা। এবিবেচনা থেকে বলা যায় — আধ্যাত্মিকতা, প্রতিবেশগত আত্মা এসব পরিবেশ সংকটকে বোঝার জন্য যথেষ্ট নয়। প্রাসঙ্গিকভাবে দাবি করা যায় — সমাজ ও এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পরিবেশ সংকট ত্বরান্বিত হয়। প্রতিবেশ সংকটকে পরিপূর্ণভাবে জানতে হলে প্রয়োজন সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে জানা। এর মাধ্যমে সম্ভব সংকটের সমাধান বের করা। কিন্তু পরিবেশ সংকটের সামাজিক স্বরূপটি উদ্ধার করতে নিবিড় প্রতিবেশবাদ ব্যর্থ হয়েছে। এ মতবাদের ভিত্তিতে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মতত্ত্ব এতোটাই স্থান করে নিয়েছে যে, পরিণতিতে এটি পরিবেশবাদ না হয়ে পরিবেশ ধর্মতত্ত্বে পর্যবসিত হয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তন বলে যে একটা বিষয় আছে সে বিষয়ে নিবিড় প্রতিবেশবাদ ততোটা অবহিত নয়। কিংবা পরিবর্তনের মতো কোনো সম্ভাবনায় তারা নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে আগ্রহী নয়। এর প্রথম ও প্রধান কারণ আবেগীয় ও দার্শনিক ভাবপ্রবণতা। এই প্রবণতাটি কখনোই রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা সৃষ্টিতে সহায়ক নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি বা সামাজিক উন্নয়ন রাজনৈতিকভাবেই সম্পন্ন করতে হয়। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ব্যতীত কার্যকর কোনো সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। এখন সেটা হোক আমাদের চিন্তা বা জীবনব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন বা স্বল্পমেয়াদি পরিবর্তন তাও রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবেই সংঘটিত হয়ে থাকে। নিবিড় প্রতিবেশবাদে এই রাজনৈতিক ভাবাদর্শ অনুসৃত না হবার ফলে পরিণতিতে এটি অ-কার্যকর, অনেকক্ষেত্রে ভাবাবেগপূর্ণ মতাদর্শে পরিণত হয়েছে বলে আপত্তি করা হচ্ছে।

উপর্যুক্ত আপত্তির সঙ্গে সমন্বয় রেখে বলা যায় — আর্ন নায়েস যেভাবে অ-নিবিড় প্রতিবেশবাদ (shallow ecology) থেকে নিবিড় প্রতিবেশবাদকে আলাদা করেছেন তাও উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিপক্ষে একটি দার্শনিক অবস্থান বলা যায়। এরকম পার্থক্যকরণে অ-নিবিড় প্রতিবেশবাদকে যেভাবে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন তাতে আপাতত মনে হতে পারে মানুষের বেঁচে থাকাটাই যেন কঠিন। এ পার্থক্য মানুষের জীবনাধরণের জন্য গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সামাজিক অগ্রগতিকে তুচ্ছ করে থাকে। তিনি মনে করছেন — উন্নয়নের প্রয়োজনে প্রযুক্তিগত প্রগতি, কলকারখানা ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যাপকহারে দূষণকে ত্বরান্বিত করছে। এই দূষণ মানুষের জীবন ও যাপনকে বিপন্ন করে তোলছে। অন্যদিকে নিবিড় প্রতিবেশবাদ মনে করছে জীবনমণ্ডলের স্বাস্থ্য ও স্বার্থকে বিবেচনায় রেখে দূষণ পরিমাপ করা উচিত। অর্থাৎ যে কোনো পরিবর্তন, হোক প্রযুক্তিগত বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন তা দূষণ সৃষ্টি করছে কি-না সেটাও পর্যবেক্ষণের

আওতায় রাখতে হবে। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের প্রাণবন্ত সত্তার স্বার্থ ও স্বাস্থ্য বিবেচনায় রেখে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এরকম দর্শনের অধীনে মানুষ তার বেঁচে থাকার মতো উন্নয়ন পরিকল্পনা কিভাবে গ্রহণ করবে তা এক বড় প্রশ্ন। এ প্রশ্নকে বিবেচনায় না এনে প্রতিবেশবাদী ডিসকোর্স নির্মাণ সম্ভব নয়।

প্রশ্ন হলো সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে মিল্‌ব্রাথ যে আপত্তি তোলেছেন তা কতোটা যুক্তিযুক্ত? মিল্‌ব্রাথের আপত্তিসমূহকে বোঝার পূর্বে আমরা জেনে নিতে পারি নায়েসের নিবিড় প্রতিবেশবাদের সঙ্গে অ-নিবিড় প্রতিবেশবাদের পার্থক্যটি কোথায়? এই পার্থক্য নির্ধারণে নায়েসের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। সুতরাং, উন্নয়ন ও দূষণের প্রশ্নকে বিবেচনায় রেখে নিবিড় প্রতিবেশবাদের বিরুদ্ধে লেস্টার মিল্‌ব্রাথ যে আপত্তি তোলেছেন পরিণতিতে তা অসাড় প্রমাণিত হয়। বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক। যেমন, উন্নয়নের নামে অ-নিবিড় প্রতিবেশবাদীগণ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রস্তাব করেন। তাঁরা মনে করেন, সংরক্ষিত সম্পদ তারাই অহরণ করতে পারবে যাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উৎকর্ষ অর্জন করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকৃতিকে সম্পদে রূপান্তরিত করাকে উৎসাহিত করা হয়। এই উৎসাহ একেবারেই নিবিড় প্রতিবেশবাদের সঙ্গে যায় না। নিবিড় প্রতিবেশবাদ জীবনকে দেখতে চায় অখণ্ড প্রকাশ হিসেবে। জগত ও প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড প্রকাশসমূহকে আলাদা আলাদা না দেখে একই সূতোয়, এক ও অভিন্ন করে দেখায়ই নিবিড় প্রতিবেশবাদী দর্শনের লক্ষ্য। এ ধারার শিক্ষা প্রাকৃতিক জগতের প্রতি আমাদেরকে দায়িত্বশীল ও সংবেদনশীল করে তুলতে পারে। এই সংবেদনশীলতা পরিবেশ তথা জীবন-সংস্কৃতির প্রতি মনোযোগী করে তোলে। গোটা পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এধরনের সংবেদশীলতা খুবই জরুরি। এই জরুরি প্রয়োজনটিই নিবিড় প্রতিবেশবাদী নায়েস ধরতে চেষ্টা করেছেন যা লেস্টার মিল্‌ব্রাথ তাঁর সমালোচনায় আনেননি বা বুঝতে চেষ্টা করেননি।

উন্নয়ন ও দূষণ নিয়ে নিবিড় প্রতিবেশবাদী অবস্থানের বিরুদ্ধে লেস্টার মিল্‌ব্রাথের অবস্থানের এদিকটির আরো বিস্তৃত পরিসরে লক্ষ করা যায় রিচার্ড এ ওয়াটসনের “A Critique of Anti-Anthropocentric Biocentrism” (Watson, 1983, pp. 245–256) নিবন্ধে। এ মতবাদে যে প্রাণকেন্দ্রিক সমতবাদী (biocentric egalitarianism) ধারা রয়েছে তার বিরুদ্ধে তিনি জোরালো আপত্তি তোলেছেন। তাঁর দাবি হলো : জীবমণ্ডলগত সমতাবাদের দিক থেকে মানুষকে প্রাকৃতিক উপাদানের সমপর্যায়ের বিবেচনা করা মানুষের অবস্থানকে হেয় করার সামিল, যা একধরনের কপটাচার। নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করাই এ কপটাচারের লক্ষ্য যা আবার মানবকেন্দ্রিক বিরোধিতাও। তাঁরা লক্ষ্য রাখেননি যে, মানুষ তখনই পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হবে, যত্ন-আত্মি করবে যখন সে বুঝতে পারবে এসব তাদের উপকারে আসছে, কাজে আসছে। নিবিড় প্রতিবেশবাদ এই উপলব্ধি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে।

নিবিড় প্রতিবেশবাদী মানসিকতা লালন করবার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। এই গ্রহের প্রকৃতিকে সংরক্ষণ তথা ভারসাম্য রক্ষার নীতিতে কাজ করার জন্য মানুষকে বেশি উদ্যেগী হতে হবে, উৎসাহী হতে হবে। কারণ মানুষের বেঁচে থাকার শর্তটি প্রাকৃতিক পরিবেশের সুস্থতার শর্তের উপর নির্ভর করে। এজন্য বেশিমাত্রায় পরিবেশবাদী হবার মাধ্যমে সম্ভব মানবকেন্দ্রিকতাবাদের বলয় থেকে বের হয়ে আসা। প্রশ্ন হলো বলয় থেকে বের হয়ে আসলেই কি সমস্যার সমাধান সম্ভব? কারণ অতিরিক্তমাত্রার পরিবেশবাদী হবার ফলে মানবজনগোষ্ঠীর উপর বড় ধরনের বিপর্যয়ও ঘটাতে পারে। পৃথিবীতে যদি মানব বসতিই বিরল হয়ে যায়, মানুষ যদি সংখ্যালঘু হয়ে যায় তাহলে প্রতিকূল প্রকৃতির মোকাবেলায় সংখ্যালঘু মানুষ অসহায় হয়ে পড়বে। এই একটি কারণে ওয়াটসন মনে করেন, নায়েস ও সেশনের পরিবেশবাদী দার্শনিক প্রকল্প একটি অকার্যকর ও ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।

ওয়াটসনের উপর্যুক্ত আপত্তিকে আমরা কিভাবে বুঝব? নায়েসের ইকোসফির সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যাক। নায়েস মানবকেন্দ্রিক মনোভাবে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সনাক্ত করেছেন। প্রশ্ন হলো — প্রতিবেশের সংকটসমূহ নিরসনে ইকোসফির কি ভূমিকা রয়েছে? মতবাদটি কি প্রতিটি প্রাণবন্ত সত্তার নিজস্ব অধিকারের মাত্রা নির্ধারণে সফলতা দেখাতে পেরেছে? নিবিড় প্রতিবেশবাদের আলোকে ওয়াটসনের এসব প্রশ্নের উত্তর কিভাবে খুঁজব? নায়েস প্রদত্ত একটি উদাহরণে এসব প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করতে পারি। নায়েস একদল নেকড়ের প্রসঙ্গ আনেন যারা একটা গ্রামে হামলা করেছিল। গ্রামবাসী লক্ষ করলো তাদের ফার্মের ভেড়ার পালের একটি ভেড়াও নেই। নেকড়ের পাল সবকয়টা ভেড়া খেয়ে ফেলেছে। গ্রামের লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে এই ভেবে যে, নেকড়েরা তাদের ভেড়া খেয়েছে, এখন বিদ্যালয়গামী শিশুদেরও খাবে। কীভাবে নেকড়ের আক্রমণ থেকে শিশুদের বাঁচানো যায় তা নিয়ে গ্রামবাসী বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। শেষতক গ্রামবাসী সিদ্ধান্তে আসে যে, ঐ নেকড়ের পাল হত্যা করাই হলো বাঁচার অন্যতম পথ। নিশ্চয়ই মানবকেন্দ্রিকতাবাদী যুক্তি নেকড়েকে বাঁচানোর পক্ষ নিবে না। প্রশ্ন হলো নেকড়েকে বাঁচানো কেন লাভজনক? মানুষের জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য এই নেকড়ে কেন উপকারী?

উপর্যুক্ত প্রশ্ন দুটির জবাব পাবার জন্য আমরা প্রদত্ত উদাহরণে ফিরতে পারি। উদাহরণে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামবাসী ভেড়া অপেক্ষা শিশুদের জীবন নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। এই উদ্বিগ্নতার কারণ হলো : গ্রামবাসী শুধু মানুষের জীবনের অন্তর্নিহিত মূল্যকে স্বীকার করে নিয়েছে, অন্যান্য অ-মানব প্রাণীর যে অন্তর্নিহিত মূল্য থাকতে পারে এবিষয়টি তারা বিবেচনায় আনেনি। একারণে তারা নেকড়ের জীবনের মূল্যকে অন্তর্নিহিত মনে করছে না। গ্রামবাসী ভেড়ার অন্তর্নিহিত মূল্যকেও স্বীকার করেননি। তারা মনে করছেন যে, মানুষের মতো ভেড়ারও বাঁচার অধিকার ও বেড়ে উঠার অধিকার আছে। এখানে লক্ষণীয় যে, নেকড়ের আক্রমণ থেকে ভেড়াকে বাঁচিয়ে রাখা, আর শিশুদের বাঁচিয়ে রাখার

মনোভাবের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। গ্রামবাসীর কাছে মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্য থাকলেও, ভেড়ার মূল্যকে তারা দেখেছ করণিক মূল্য (instrumental values) হিসেবে। কিন্তু, সকল প্রাণবন্ত সত্তার অন্তর্নিহিত মূল্য ভাবনা থেকে যদি সিদ্ধান্ত নিই তাহলে আমাদের মানতে হবে যে, নেকড়ের অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে। কোনো কিছুর মূল্যকে মেনে নেবার অর্থ হলো এর প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্যকে মেনে নেওয়া। এই দায়িত্ব কর্তব্যের কারণে এদেরকে হত্যা করা উচিত নয়। এ দাবি নায়েসের বিরুদ্ধে উত্থাপিত ওয়াটসনের আপত্তিকেও অকার্যকর করে দেয়।

ঔচিত্যের উপর্যুক্ত ধারণার কারণেই গ্রামবাসীর উচিত শিশু ও ভেড়া উভয়ের মতো ঐ নেকড়ের জীবন কিভাবে বাঁচানো যায় তা নিয়ে চিন্তা করা? গ্রামবাসীর জন্য কোনটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত? প্রাণের অন্তর্নিহিত মূল্য ও সমতাবাদকে অব্যাহত রাখলে আদৌ কি উচিত হবে ঐ নেকড়ের পাল হত্যা করা? প্রশ্ন হলো — নেকড়েদের বাঁচিয়ে রেখে গ্রামবাসী ও তাদের শিশুদের জীবনের নিরাপত্তা কতোটুকু সংরক্ষিত হবে? এ প্রশ্নে গ্রামবাসীদের বিচক্ষণ হবার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু, বিচক্ষণতা কি অন্তর্নিহিত মূল্য ধারণার সঙ্গে যায়? বিচক্ষণতা আর অন্তর্নিহিত মূল্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমতাবাদ পরস্পর বিরোধী যার তীর্যক সমাধান নিবিড় প্রতিবেশবাদে নেই। বিচক্ষণতা মানবীয় গুণাবলী। প্রথমত, শিশুরা মানবপ্রজাতির সদস্য বিধায় অন্তর্নিহিত মূল্যের দাবিতে শিশুদের বাঁচানোর তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও প্রোটিন যোগানের কারণে ভেড়া বাঁচিয়ে রাখার সঙ্গে মানবীয় বিচক্ষণতা জড়িত। আমরা যদি প্রাণবন্ত সত্তার অন্তর্নিহিত মূল্য ও সমতাবাদকে মেনে নিই তাহলে শিশু, ভেড়া ও নেকড়ে সবারই প্রাণের মূল্যকে সমানভাবে মূল্য দিতে হবে। কিন্তু, বিচক্ষণতা অন্য সিদ্ধান্ত দেয়। এই বৈপরীত্যের কারণে বলা যায় — বিচক্ষণতা ও অন্তর্নিহিত মূল্য একসাথে কাজ করে না। যুক্তি ও বিচক্ষণতা হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে যুক্ত, আর অন্তর্নিহিত মূল্য সমতার সর্বজনীন পথ তৈরি করে। নায়েস জীবমণ্ডলগত সমতার ভিত্তি হিসেবে অন্তর্নিহিত মূল্যকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর সমালোচকগণ এ বিষয়টি ধর্তব্যে আনেননি বলেই সমতাবাদকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

যুক্তি ও বিচক্ষণতার দাবি মানবকেন্দ্রিকও (anthropocentric)। মানুষের যুক্তি ও বিচক্ষণতা রয়েছে, অ-মানব প্রাণীর তা নেই। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বিভাজনরেখা টানার ক্ষেত্রে এ দুটি শর্তকেই বিবেচনা করতে হয়। নিবিড় প্রতিবেশবাদ অন্তত এদিকটি সম্পর্কে যথার্থ অবস্থান নিতে সক্ষম হয়েছে। এ মতবাদ শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বার্থকেই বিবেচনা করেনি, বরং মানবস্বার্থ পরিপন্থি মতাদর্শিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধেও আপত্তি তোলেছে। মানুষ ও পরিবেশের প্রতি নিবিড় প্রতিবেশবাদের সমতাবাদী মনোভাবটি বুঝতে অনেক দার্শনিকই ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতার কারণে তাঁরা এ মতবাদটিকে মানববিদ্বেষী হিসেবে অভিহিত করেছে। মারে বুকচিনও (Bookchin, 1987) নিবিড় প্রতিবেশবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন মানবতার প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মতবাদ

হিসেবে। একইভাবে ডেভিড ফোরম্যান (Foreman, 1991) বলেন, প্রাণের জগতে এ মতবাদ মানুষকে দেখেছে এক ক্যান্সার হিসেবে। বুকচিন দাবি করেন, নিবিড় প্রতিবেশবাদ পরিবেশ সংকটকে কর্তৃত্ববাদী অবস্থা থেকে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। পরিবেশ সংকটের উৎস মূলত মানুষের সঙ্গে সমাজের মিথস্ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। আর একারণে সাংস্কৃতিক মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা পরিবেশ সংকট সমাধান করতে পারি। জীবমণ্ডলগত যে ধ্বংস বা বিপর্যয় হচ্ছে তার কাঠামোগত ভিত্তি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবকাঠামোর মধ্যে নিহিত। নিবিড় প্রতিবেশবাদী মতাদর্শিগণ এবিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই তারা পরিবেশবাদী ডিসকোর্স নির্মাণে মানববিদ্বেষী অবস্থান নিয়েছেন। একই ধরনের অভিযোগ দাঁড় করিয়েছেন ফ্রান্স দার্শনিক লুক ফেরি (Ferry, 1995)। তিনি বলেন, নিবিড় প্রতিবেশবাদ নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশল হিসেবে অসমর্থ। অ-মানব সত্তা অপেক্ষা মানব জীবনের গুরুত্ব যে বেশি এ মতবাদ তা সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার কারণে তাঁরা মানুষ অপেক্ষা প্রকৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেছে। সমগ্র পরিবেশের লাভের জন্য মানব জীবনের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেবার প্রস্তাবনা একধরনের প্রতিবেশগত ফ্যাসিবাদের (ecofascism) নামান্তর।

নিবিড় প্রতিবেশবাদের বিরুদ্ধে উপর্যুক্ত সবকয়টি সমালোচনা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে গৃহীত। এসব সমালোচনার যথোপযুক্ত জবাব দিয়েছেন ভারভাইক ফক্স (Fox, 1990)। প্রত্যক্ষভাবে বিচার করলে বলা যায় — পরিবেশের প্রতি মানুষের যে দায়িত্বশীলতা তা মূলত দীর্ঘস্থায়ী জীবনকে অভিবাদন জানায়। বেঁচে থাকার জন্য নিবিড় প্রতিবেশবাদ মানুষকে এক বিকল্প জীবনে বিশ্বাসী করে তোলেছে। এই বিকল্প জীবনের লক্ষ্যই হলো আনন্দপূর্ণ, পরিবেশ প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে দীর্ঘজীবী জীবনের প্রতিশ্রুতি নির্মাণ করা। সুতরাং, নিবিড় প্রতিবেশবাদকে যদি এদিক থেকে বিবেচনা করা যায় তাহলে কেবল সম্ভব এর মানব-বিদ্বেষী অভিযোগটিকে অসাড় প্রমাণ করা।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এ মতবাদ সম্বন্ধমূলক ও সামগ্রিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতিকে বিবেচনা করেছে। তাঁরা মনে করেছেন, প্রকৃতি এক জটিল জালের বিন্যাসে সম্পর্কিত। আর প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের রয়েছে অন্তর্নিহিত মূল্য। প্রাসঙ্গিক কারণে প্রশ্ন হতে পারে : অন্তর্নিহিত মূল্যের ধারণা কি সকল ক্ষেত্রে ও বাস্তবতায় সমানভাবে প্রযোজ্য? যদি কেউ দাবি করেন, প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে মানুষ আলাদা। মানুষকে বিশ্ব-প্রকৃতির কেন্দ্রে ভাবাই সমকালীন পরিবেশ সংকটের মূল দায়। নানাকারণে মানুষকে ভাবা হয় সবকিছুর ঊর্ধ্বে। প্রাকৃতিক সংহতির প্রশ্নে মানুষকেও প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে হবে। এরকম বক্তব্যকে সামনে রেখে অনেক সমালোচক দাবি করতে পারেন — নিবিড় প্রতিবেশবাদ মানব স্বার্থ পরিপন্থি। বাস্তবে কি মানুষকে বাদ দিয়ে পরিবেশ ও প্রকৃতির কোনো মূল্য রয়েছে? আর নিবিড় প্রতিবেশ কি এরকমটি মনে করে? এরকম প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি —

নিবিড় প্রতিবেশবাদের মৌলিক যে কাঠামো তার মূল বক্তব্য হলো পরিবেশের উপর মানুষের আধিপত্য কমিয়ে আনার পথ বাতলে দেওয়া। মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন ও প্রযুক্তিগত বিকাশের কারণে মাত্রাতিরিক্ত হারে বাড়ছে প্রকৃতি শোষণ ও বিনাশ। অথচ কেউই বলছে না প্রকৃতির উপর এই হস্তক্ষেপ অব্যাহত থাকলে একসময় এই গ্রহটি হয়ে উঠবে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কঠিন পরীক্ষা। একারণে মানব হস্তক্ষেপকে বিনাশ করা উচিত। এরকম ভাবনা নিঃসন্দেহে র‍্যাডিকেল আন্দোলনের প্রতিভাষ্য। এই প্রতিভাষ্য পৃথিবী জুড়ে পরিবেশ অধিকারবাদী আন্দোলনকে বেশ প্রাসঙ্গিক করে তোলেছে। এই প্রাসঙ্গিকতার কারণে আমরা বুঝতে চেষ্টা করছি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের স্বরূপটি। মানুষের উপর পরিবেশের বিষময় প্রতিক্রিয়া ও পরিবেশের প্রতি মানুষের আধিপত্যবাদী মানসিকতা দূর করার লক্ষ্যে এসব বোঝাপড়া খুবই জরুরি। মানুষ পরিবেশ থেকে আলাদা, বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে ভাববার সমকালীন মানসিকতাকে প্রশ্ন করাই এর চূড়ান্ত লক্ষ্য। নায়েস মনে করেন, প্রকৃতিকে কখনোই বিচ্ছিন্ন বা আলাদা মনে করা যাবে না। আবার মানুষও তার পরিপার্শ্ব বা পরিবেশ থেকে আলাদা নয়। “A Defense of the Deep Ecology Movement” (Naess, 1984) প্রবন্ধে নায়েস এরকমটিই দাবি করেছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলছেন, ইকোসফিতে এমন কোনো আদর্শ নেই যা প্রকৃতির পূর্ণজীবনের পরিপন্থি। ইকোসফি বলতে তিনি বুঝেছেন, “মানুষের পরিপূর্ণ উপলব্ধিকে। সুতরাং, মানুষের এই পরিপূর্ণ উপলব্ধি নিশ্চয়ই মানুষকে হেয় বা তুচ্ছ করে দেখার নয়। বরং মানুষকে দায়ে ও কর্তব্যে মাহিমান্বিত করাই এ মতবাদের দার্শনিক লক্ষ্য। এ বিবেচনায় নায়েসের নিবিড় প্রতিবেশবাদকে মানববিদ্বেষী বলা যায় না।

উপর্যুক্ত আলোচনায় নিবিড় প্রতিবেশবাদের বিরুদ্ধে যেসব সমালোচনা উত্থাপিত হয়েছে তার যৌক্তিকতা নিয়েও পাল্টা প্রশ্ন করা যাচ্ছে। এসব প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তর উত্থাপিত সমালোচনার অসাড়তাই প্রমাণ করে। এ প্রসঙ্গে আমরা আরো কতোগুলো প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে পারি : নিবিড় প্রতিবেশবাদে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্যকে কিভাবে বিবেচনা করা হয়? কিংবা প্রাণবন্ত সত্তার অন্তর্নিহিত মূল্য থাকার সঙ্গে এর সমতার ধারণা কতোটুকু যুক্তিযুক্ত? পরবর্তী অনুচ্ছেদে নিবিড় প্রতিবেশের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াস নেয়া হবে।

৩.২ *নিবিড় প্রতিবেশবাদ: অন্তর্নিহিত মূল্য ও সমতাবাদ*

নিবিড় প্রতিবেশবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর মূল্যবিদ্যাগত সমতাবাদ (axiological egalitarianism)। সমালোচকদের অনেকেই (Keller, 2009, p. 208) বলেন, এ মতবাদ ব্যবহারিক জীবনের জন্য অনুপযোগী ও স্বার্থগত দ্বন্দ্ব সমাধানের প্রশ্নে বিচারহীন। সমতার প্রসঙ্গে আসা যাক। যদি ধরে নিই প্রাকৃতিক জগতে সকল অর্গানিজমের সমান মূল্য রয়েছে, তাহলে আমাদের কতোগুলো সংকট মোকাবেলা

করতে হতে পারে। প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে এরকম দাবির ভিত্তি কি? "সকল প্রাণবন্ত সত্তার মূল্য সমান" — এ দাবির উপর ভিত্তি করে আমরা কি কোনো পরামর্শ দিতে পারি? কেলার মনে করেন, বাস্তবে তা সম্ভব নয়। কারণ পরিবেশ নীতিবিদ্যায় নৈতিক বাস্তবতার মূল্য নির্ধারণ করার জন্য মূল্যগত ক্রম বা বিভাজন করার প্রয়োজন হতে পারে। এই প্রয়োজনটি খুবই জরুরি হয়ে পড়ে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসনের ক্ষেত্রে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। ধরা যাক, কারো বাসায় প্রাণঘাতি অর্গানিজমের বিকাশ ঘটেছে। হতে পারে সেটা গৃহপালিত বিড়ালকে মিথোজীবী করে এই প্রাণঘাতি অর্গানিজমের বিস্তার ঘটছে। যদি প্রাণের মূল্যকে সমতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করি তাহলে বিড়ালের জীবনের মূল্য, প্রাণঘাতী বায়ো-অর্গানিজমের মূল্য আর মানুষের মূল্যের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই একথা মানতে হবে। এই পার্থক্য মানুষের সঙ্গেও নেই। তাহলে সমানে সমান মূল্যধারণকারী প্রত্যেকটি প্রাণবন্ত সত্তার গুরুত্বকে নিবিড় প্রতিবেশবাদ সমানভাবে দেখবে এটাই স্বাভাবিক। এই বিবেচনা আমাদেরকে নির্দেশ করছে প্রাণঘাতী হলেও বায়ো-অর্গানিজম তথা এটি বহনকারী প্রাণী উভয়ের কাউকে হত্যা করা যাবে না।

বাস্তবিক ক্ষেত্রে সমতার এই রীতি কি আমরা অনুসরণ করতে পারি? নিশ্চয়ই না। মানুষ যেভাবে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারে, বেঁচে থাকার জন্য স্বতোপ্রণোদিত আচরণ করতে পারে, ঠিক সেই মাত্রার কার্যক্রম বায়ো-অর্গানিজম বা বিড়ালের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে অন্যান্য প্রাণবন্ত সত্তা অপেক্ষা মানুষের বেঁচে থাকার শর্তটি অগ্রাধিকার পাবে। যদি তাই হয় তাহলে মানুষ তার বেঁচে থাকার শর্তটিকে অগ্রাধিকার দিবে। এই অগ্রাধিকারের কারণে বিড়াল ও প্রাণঘাতী বায়ো-অর্গানিজম ধ্বংস করার উদ্যোগ নেবে এটাই স্বাভাবিক। প্রশ্ন হতে পারে জীবনের মূল্যের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে এরকম মানবকেন্দ্রিক উদ্যোগ কি গ্রহণযোগ্য? যেখানে অন্যান্য প্রাণবন্ত সত্তার জীবনের মূল্য অপেক্ষা মানুষের জীবনের মূল্য অগ্রাধিকার পাচ্ছে সেখানে প্রাণের সমতাবাদ কতোটা কার্যকর? এ প্রশ্নের পর্যাপ্ত সদুত্তর নেই নিবিড় প্রতিবেশবাদে। এবিবেচনায় ডেভিড কেলারের (Keller, 2009, p.208) দাবি যথার্থ। তিনি দাবি করছেন, নিবিড় প্রতিবেশবাদ স্বার্থের দ্বন্দ্বের প্রশ্নে বিকল্প কোনো সমাধান রাখেনি। আর বিদ্যমান যে সমাধান রয়েছে তা জীবমণ্ডলগত সমতাবাদের অন্তরায়। কিন্তু জীবমণ্ডলগত সমতাবাদ কি আদৌ বাস্তবসম্মত?

পরিবেশবাদী আরো কতোগুলো দৃষ্টান্তের সাহায্যে জীবমণ্ডলগত সমতাবাদকে (bio-egalitarianism) অসাড় দেখানো যায়। এ প্রসঙ্গে পার্ক-ব্যবস্থাপনার কথা ধরা যাক। ক্ষেত্রবিশেষে পরিবেশের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে। পরিবেশের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য হয়তো পার্কের বিশেষ কোনো প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদকে বিনাশ করার প্রয়োজন হতে পারে। বিনাশ আর অন্তর্নিহিত মূল্য পরস্পরবিরোধী। নিবিড়ি প্রতিবেশবাদ এ বিরোধটি স্পষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। একটি উদাহরণ দিয়ে

বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক : ধরা যাক, ঐ পার্কের বহুপ্রজাতির প্রাণী রয়েছে যার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য বিশেষ একটি সর্বভূক প্রাণীর অবাধ বংশবৃদ্ধি রোধ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বংশবিস্তারের সক্ষমতা ও টিকে থাকার লড়াইয়ে সহনশীল বিধায় পার্কে কথিত এ প্রাণীটির আনুপাতিক সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত প্রাণীর অবাধ বৃদ্ধির কারণে তাদের খাদ্য ও বাস্তুসংস্থানগত সহজলভ্যতার কারণে অন্যান্য প্রাণী ও বনের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। ফলত পার্কের এই মারাত্মক বিপর্যয় রোধ করার জন্য পার্ক কর্তৃপক্ষ উক্ত হিংস্র-প্রাণিটি কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। পার্কের পরিবেশগত ভারসাম্য বলতে আপাতত যে কেউই বুঝবেন, সর্বভুক ঐ প্রাণী যারা অন্যান্য প্রাণী বিলুপ্তির জন্য দায়ী তাদেরকে কমিয়ে আনা। প্রশ্ন হতে পারে কমিয়ে আনা বলতে আমরা কি বুঝব? উক্ত বাস্তবতায় কমিয়ে আনা বলতে নিধন করাকে বুঝাচ্ছে। এই নিধন প্রকারান্তরে প্রাণীর অন্তর্নিহিত মূল্যকে তুচ্ছজ্ঞান করে দেখা। সকল প্রাণবন্ত সত্তার অন্তনির্হিত মূল্য রয়েছে, এই মূল্য সকল ভেদেই সমান — এই নীতিতে অটুট থাকতে হলে মাংসাশী হিংস্র প্রাণীর জীবনরক্ষার শর্তটি অন্য প্রাণী থেকে কোনোভাবেই ব্যতিক্রম করে দেখা উচিত নয়। তাহলে পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার সমকালীন ডিসকোর্স আর নিবিড় প্রতিবেশবাদের প্রাণকেন্দ্রিক সমতাবাদ পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থায় পর্যবসিত হয়। আমরা কি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য কোনো ভূমিকা রাখব না? তাহলে আমরা কি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা নীতি গ্রহণ করব, নাকি প্রাণকেন্দ্রিক সমতাবাদের উপর গুরুত্ব দেব? আমরা যদি সমকালীন পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা নীতি অবলম্বন করি তাহলে নিধনের পক্ষে অবস্থান নিব। আর নিবিড় প্রতিবেশবাদী নীতিকে মেনে চললে অন্তর্নিহিত মূল্যকে গুরুত্ব দিতে হবে যা ভারসামের পরিবেশবাদী সমতা নীতিকে উৎসাহিত করে।

উপর্যুক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় আমরা যদি নিবিড় প্রতিবেশবাদী মূল্যবোধের আলোকে পরিবেশ সম্পর্কে ভাবনা নির্মাণ করতে চাই তাহলে প্রাণকেন্দ্রিক সমতাবাদের পক্ষেই অবস্থান নিতে হবে। এই মতধারার মধ্যে পরিবেশগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্য ও এর প্রতিটি উপাদানের মধ্যকার সমতার ধারণাকে মেনে নিতে হবে। নিবিড় প্রতিবেশবাদের এই ধারায় প্রকৃত কোনো পরিবেশ পলিসি প্রণয়ন কিংবা জীবন-যাপন করা অবাস্তবসম্মত হয়ে উঠতে পারে। পরিবেশগত ভারসাম্য একটি স্বাভাবিক বিষয়। এই স্বাভাবিক ব্যাপারটি আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অহরহই ঘটে চলছে। যেমন, সাপ, গুইসাপ, ইদুঁর আর ফসলী জমি এরকম পরিবেশগত অবস্থায় ভারসাম্যের বিষয়টি কিভাবে কাজ করে দেখা যাক। ইদুঁর ফসলী জমি নষ্ট করে। সাধারণত ইদুঁর নিধনের জন্য আমরা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি। কৃত্রিম ব্যবস্থায় ফাঁদ পেতে ইদুঁর নিধন করা হয়। আর প্রাকৃতিক ভারসাম্য নীতিটি হলো সাপ, গুঁইসাপ কিংবা এরকম আরো অন্যান্য প্রাণী যদি ঐ ফসলী জমির বাস্তু-এলাকায় পর্যাপ্ত করা যায় তাহলে এরাই ইদুঁরের বংশবিস্তার রোধ করবে। সুতরাং, প্রকৃতি নিজেই

তার আপন অবস্থান থেকে ভারসাম্য রক্ষায় কাজ করে থাকে। আপতিক বা কৃত্রিম বিকল্পের প্রয়োজন নেই। কৃত্রিম বিকল্প পরিবেশের ভারসাম্য তথা স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে যায়।

প্রাকৃতিক জগতের ভারসাম্য রক্ষায় প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ নিজেরাই পারস্পরিক নিধনে অংশগ্রহণ করে থাকে। যেমন, সাপ ও গুইসাপ তার জীবন ধারণের জন্য ইদুঁরকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে। ফলে ইদুঁরের অতিরিক্ত বংশবিস্তারও রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। রক্ষা পাচ্ছে ফসল। প্রশ্ন হলো এই ভারসাম্য রক্ষায় ইদুঁরের অন্তনির্হিত মূল্য তথা প্রাকৃতিক জগতের সকল প্রাণীর সমতাবিধানের বিধিটি কিন্তু সেইভাবে কার্যকর হচ্ছে না। প্রসঙ্গক্রমে পূর্বের দৃষ্টান্তে ফিরে আসা যাক। বিড়ালকে কেন্দ্র করে যে প্রাণঘাতী বায়ো-অর্গানিজমের বিকাশ ঘটছে তা থেকে মানুষের জীবন পরিত্রাণ করবার জন্য বিড়ালে বিষাক্ত ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে প্রাণঘাতি বায়ো-অর্গানিজমকে বিনাশ করা হলো। উপর্যুক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে পারি :

এক. উল্লিখিত ঘটনায় প্রাণের যে বিনাশ ঘটানো হয়েছে তাতে আমরা সমতার নীতি অনুসরণ করিনি।

দুই. এখানে মানুষের বেঁচে থাকার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিশেষ কোনো প্রাণবন্ত সত্তাকে অগ্রাধিকার দেবার অর্থই হলো প্রাণের গুণগত মাত্রা ও সমতার মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি করা। প্রাণের গুণগত মাত্রায় উচ্চানুক্রমিক মূল্যকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত।

উপর্যুক্ত ধারণা দুটির আলোকে আমরা বলতে পারি : ব্যবহারিক জীবনে অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে পরিবেশসম্মত। কিন্তু নিবিড় প্রতিবেশবাদের প্রাণকেন্দ্রিক সমতাবাদী নীতির সঙ্গে বৈরি সৃষ্টি করে। পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা নীতির সঙ্গে নিবিড় প্রতিবেশবাদের যে বৈরি তা একান্তই ব্যবহারিক প্রয়োগের কারণে। আর প্রাণকেন্দ্রিক সমতাবাদ হলো তাত্ত্বিক। প্রশ্ন হতে পারে : পরিবেশগত বাস্তবতায় তত্ত্ব ও ব্যবহারিকতার মধ্যে কোনটিকে আমরা গ্রহণ করব? এরকম একটি সমস্যাকে বিবেচনায় রেখে নিবিড় প্রতিবেশেবাদের দার্শনিক পুনঃসংস্কার করা যেতে পারে। যেখানে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নতুন নীতিসমূহ ভূমিকার রাখতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আরো একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে : নিবিড় প্রতিবেশবাদকে আমরা কি তাত্ত্বিক হিসেবে বিবেচনা করব, নাকি ব্যবহারিক দিক থেকে? যদি বলি পরিবেশ সংকট হলো আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সুতরাং তার সমাধানও হতে হবে ব্যবহারিক উপায়ে। সেশনও দাবি করছেন, নিবিড় প্রতিবেশবাদ সমকালীন পরিবেশ সংকট সমাধানের একটি কৌশল। ব্যবহারিক জীবনে এই কৌশল প্রয়োগ করে সংকটের সমাধান করা সম্ভব। তাহলে পরিবেশবাদী দর্শনের ব্যবহারিক হবার দাবিটি খুবই প্রাসঙ্গিক। নিবিড়

প্রতিবেশবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব নয়। তাহলে কি ধরে নেব এ মতবাদ ব্যবহারিক অপেক্ষা তাত্ত্বিক? তত্ত্বের অস্তিত্ব এর প্রয়োগ ব্যতীত সম্ভব নয়। প্রয়োগ নির্দেশনা পায় তত্ত্বের মাধ্যমে। এজন্য তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে সমন্বয় প্রয়াস নিবিড় প্রতিবেশবাদকে নতুন মাত্রা দিতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রথমেই আমরা দাবি করেছি পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিবিড় প্রতিবেশবাদের বৈরি সম্পর্ক রয়েছে। প্রশ্ন হলো পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা কি সকল সময় পরিবেশ সংকট নিরসনের একমাত্র জবাব হতে পারে? এ প্রসঙ্গে জেমস র‍্যাচেল (১৯৬২) উল্লিখিত একটি ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। আমেরিকার কোনো এক মিউনিসিপল কর্পোরেশনের পরিবেশ কর্মকর্তাগণ লক্ষ করেছেন তাদের পার্কে হায়েনার সংখ্যা বেড়ে গেছে। ফলে হরিণের সংখ্যাও সেই অনুপাতে কমছে। তাদের বিশেষ কমিটি সিদ্ধান্ত নিলো হায়েনা নিধনের। সিদ্ধান্ত কার্যকরের বছর খানেকের মধ্যে লক্ষ করা গেলে সেই অরণ্যে হরিণের সংখ্যা গুণিতক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির ফলে হরিণের খাবারের জন্য পার্কের উদ্ভিদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়। এই চাপে ক্রমান্বয়ে উদ্ভিদশূণ্য হতে থাকে পার্কটি। উদ্ভিদশূণ্যতার ফলে হরিণের সংখ্যানুপাতে খাবারের চরম ঘাটতি দেখা দেয়। এই ঘাটতির ফলে হরিণের সংখ্যাও কমতে থাকে। পরিবেশের ভারাসাম্য রক্ষার নামে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত একটি অরণ্যকে ধ্বংস করেছে। ধ্বংস হয়েছে তার প্রাণ ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য। পরিবেশের ভারসাম্য বলতে তাহলে কি ধ্বংসকে বুঝব? এ প্রশ্নটি পরিকল্পিত ভারসাম্য রক্ষা নীতির বিরুদ্ধে যায়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নীতিকে আমাদের বিপাকক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় মেটাবলিজম, ক্যাটাবলিজম, পাচক রস বা এনজাইম এরা পারস্পরিক ভারাসম্য নীতিতে গোটা বিপাকক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। কৃত্রিম কোনো হস্তক্ষেপ হলেই সেখানে বাধা সৃষ্টি হয়। সুতরাং, জীবনের অন্তর্নিহিত মূল্য অন্য কোনো যান্ত্রিক বা মানবকেন্দ্রিক ভাবনার উপর নির্ভর করে না। এটি একেবারেই একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ঘটনা। এদিক বিবেচনা করলে পরিবেশের ভারাসাম্যের দোহাই দিয়ে নিবিড় প্রতিবেশবাদের বিরুদ্ধে খুব একটা শক্ত অবস্থান নেওয়া যাবে না।

উপর্যুক্ত যে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়েছে তা কৃত্রিম ভারসাম্য নীতির পক্ষাবলম্বন করে থাকে। কৃত্রিম ভারসাম্য নীতির সমস্যা হলো অগ্রাধিকার প্রদানের সমস্যা। মানুষ ও অ-মানব প্রাণবন্ত সত্তার মধ্যে কে অগ্রাধিকার পাবে? মানুষ নাকি অন্যান্য অ-মানব প্রাণবন্ত সত্তা, বায়ো-অর্গানিজম, নাকি উদ্ভিদ বা মাটি? উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি মানুষ তার প্রয়োজনে, বেঁচে থাকার জন্য কিংবা জীবন-যাপন ও নিরাপত্তার জন্য নিজের জীবনকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। বিড়াল কিংবা বায়ো-অর্গানিজম এখানে গুরুত্ব পায় না। এই অগ্রাধিকার নিশ্চয়ই প্রাণবন্ত সত্তার অন্তর্নির্হিত মূল্যের গুরুত্বকে গৌণ করে দেখা হয়। প্রাণবন্ত কিংবা অ-প্রাণবন্ত সত্তার সমতার ধারণাও এখানে তুচ্ছ করে দেখা হয়। অগ্রাধিকারের এই দৃষ্টান্তটি নিবিড়

প্রতিবেশবাদের সমতাবাদী ধারার বিরুদ্ধে যায়। তা সত্ত্বেও নায়েস (Naess, 1989) জীবমণ্ডলগত সমতাবাদের (Biospherical egalitarianism) পক্ষেই অবস্থান নিয়েছেন। নিবিড় প্রতিবেশবাদ যেন উপর্যুক্ত সংকটের মুখোমুখি না হয় সেই বিবেচনাকে গুরুত্বে দিয়ে তিনি পূর্ব অবস্থান থেকে একটু সরে এসেছেন। জীবমণ্ডলগত সমতাবাদের পরিবর্তে *জীবমণ্ডলগত সমতাবাদ : নীতিগত* (*Biospherical egalitarianism : in principle*) শিরোনামে সমতাবাদের প্রস্তাব করেন। *নীতিগত* শব্দটি দ্বারা তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অনেক সময় হত্যার প্রয়োজন হতে পারে, অন্য প্রজাতির উপর দমন ও শোষণের প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে এসব ব্যতিক্রমকে মানতে হবে। তবে নীতিগতভাবে আমাদের লক্ষ হলো সমতাবাদ। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আমরা যেন সমতাবাদী নীতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন না করি। তুচ্ছ প্রয়োজনে অন্য কোনো প্রাণবন্ত সত্তাকে আহত বা নিহত না করি। এখানে তিনি পরিপূর্ণ সমতাবাদী নীতিতে কাজ করার পরামর্শ করেন। সুতরাং, অগ্রাধিকারের গুরুত্ব নিবিড় প্রতিবেশবাদে গুরুত্ব দেয়নি এরকম অভিযোগ শেষতক যুক্তিযুক্ত ভাবা যায় না। উক্ত প্রেক্ষাপটে এটাই মানতে হবে যে, এ মতবাদ মানুষের একচ্ছত্র অগ্রাধিকার দেয়নি।

উপর্যুক্ত প্রসঙ্গে আমরা যে প্রশ্নটি দাঁড় করাতে পারি : আর্ন নায়েসের জীবমণ্ডলগত সমতাবাদ কি নীতিগতভাবে সংগতিপূর্ণ? মানুষের প্রয়োজনে, বিশেষ বাস্তবতায় অন্য প্রাণবন্ত সত্তাকে হত্যা করা কি নীতিগত কারণে সমর্থন করা যায়? এরকম প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি : মানুষ তার প্রয়োজনে শুধু অ-মানব প্রাণী নয়, মানুষকেও হত্যা করছে। যেমন, পৃথিবীর অনেক দেশের বৈচারিক প্রক্রিয়ায় মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা রয়েছে। অনেক সামাজিক ও আইনীয় ব্যবস্থায় অপরাধীকে নিবৃত্ত করার জন্য, কিংবা ভবিষ্যতের কেউ যেন জঘন্য অপরাধ না করে তার প্রতিকারের জন্য মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থার বিধান প্রচলিত রয়েছে। এ বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবেও স্বীকৃত। বিচারের রায়ে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডও দেয়া হচ্ছে। নিবিড় প্রতিবেশবাদের অন্তর্নিহিত মূল্যের ধারণাটি এখানে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করবে? এপ্রশ্নের যুক্তিযুক্ত জবাব নিবিড় প্রতিবেশবাদে নেই।

বৈশ্বিক ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সম্পর্কেও একই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও যুদ্ধ এসব প্রক্রিয়াও প্রতিনিয়ত স্খলন ঘটছে মানুষের অন্তনির্হিত মূল্য বা মানব মর্যাদার। পৃথিবীর ধনী রাষ্ট্রসমূহ যে-পরিমাণ খাদ্যশস্যের অপচয় করছে, কিংবা খাদ্য রাজনীতির জটিল জালে খাদ্যশস্য আটলান্টিকে নিক্ষেপ করছে, অথবা মানুষ মারার জন্য যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনে অর্থের অপচয় করছে তার কিয়দংশ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ মেটাতে পারে। অনেক ধনী রাষ্ট্র খাদ্য বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্য আটলান্টিকে নিক্ষেপ করছে। খাদ্যশস্য থেকে বায়ো-ফুয়েল উৎপাদন করছে, বিলাসী জীবন যাপনের জন্য অহেতুক অর্থ অপচয় করছে। অথচ পৃথিবী জুড়ে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ ক্ষুধা, চিকিৎসা ও যুদ্ধে নিহত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্য কতোটা স্বীকৃতি

পাচ্ছে? আমরা লক্ষ করে দেখব ধনী ও ক্ষমতাধর রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্নিহিত মূল্য আর এশিয়া কিংবা আফ্রিকানদের অন্তর্নিহিত মূল্যের মধ্যে বিষম সম্পর্ক রয়েছে। এসব দৃষ্টান্ত নিবিড় প্রতিবেশবাদের "*জীবমণ্ডলগত সমতাবাদী : নীতিগত*" দাবিকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সবমিলিয়ে নায়েসের *নীতিগত জীবমণ্ডলগত সমতাবাদ* মনুষ্য সমাজের হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনাকে বৈধতা দিতে পারে। তবে সমতাবাদের এসব সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় রেখে যদি এর পুনঃসংস্কারের উদ্যেগ নেওয়া হয় তাহলে মানব মর্যাদা ও পরিবেশ মর্যাদার বিষয়ে এ এক বিকল্প চিন্তা হতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে : নিবিড় প্রতিবেশবাদীদের সমতাবাদী, কিংবা *নীতিগত সমতাবাদী* কোনোটিই সামগ্রিক পরিপূর্ণতার ঊর্ধ্বে নয়। এর সঙ্গে আধিবিদ্যক আচ্ছন্নতাও রয়েছে। নিবিড় প্রতিবেশবাদের সর্বজনীন হবার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হতে পারে এর অধিবিদ্যক আচ্ছন্নতা। যেমন আত্মা, আত্মোপলব্ধি সম্পর্কে এ মতবাদের ভাববাদী দিকটিও সমালোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হতে পারে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা এ সম্পকিত ভাবনা পর্যালোচনা করার প্রয়াস নেব। এই প্রয়াসের লক্ষ্য হলো : উক্ত মতবাদের সংস্কার সাধনে নতুন কোনো তৎপরতাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া।

৩.৩ আত্মা, প্রতিবেশগত আত্মা ও প্রসারিত আত্মার ধারণা

নিবিড় প্রতিবেশবাদের *আত্মা* (self) ও *প্রতিবেশগত আত্মার* (ecological self) ধারণা পর্যালোচনা করে উপর্যুক্ত প্রসঙ্গটিকে আরো প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। পরিবেশের মধ্যে মানুষের ভূমিকা কি হবে সে প্রসঙ্গটি প্রতিবেশগত আত্মার (ecological self) ধারণায় আলোকপাত করা হয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। এ প্রসঙ্গের সূত্র ধরে আমরা নিবিড় প্রতিবেশবাদী বিল দেভালের (Devall, 1988) অবদানও আলোচনা করতে পারি। তিনি মনে করছেন, নিবিড় প্রতিবেশবাদী নীতির আলোকেই আমরা ব্যবহারিক জীবন যাপন করতে পারি। দেভালের মতে, *প্রতিবেশগত আত্মা* হলো পরিবেশ ও প্রকৃতির দিকে অতিবর্তি যাত্রা। এদের সম্পর্কে সচেতনতা, পরিপূর্ণতা, সংবেদনশীলতা তথা যত্ন-আত্মিপুর্ণ মানসিকতা। *প্রতিবেশগত আত্মার* দিকে অভিযাত্রায় সংবেদনশীলতা অবশ্যই ভূমিকা রাখবে। কিন্তু, আমাদের পারিপার্শ্বিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ অভিযাত্রাকে নিরুৎসাহিত করে থাকে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। প্রকৃতি সাপেক্ষে এ আত্মা স্বতন্ত্র কিংবা *অন্যসত্তা* (others) নয়। প্রতিবেশগত আত্মা ব্যক্তি আত্মারই উন্নততর বিকাশ। এই বিকাশ দাবি করছে যে, মানুষকে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র ও আলাদা ভাবার অর্থ হলো আমরা প্রকৃতিকে বিপন্ন করার অধিকার রাখি, তাকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারি, আমাদের স্বার্থে তাকে যথেচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। প্রকৃতিকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ হলো —অন্যসত্তার

(otherness) সঙ্গে আমাদের পরিচয় মেলানোর ব্যর্থতা। এজন্যই নিবিড় প্রতিবেশবাদ দাবি করে — মানুষের উচিত প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের স্বরূপ বোঝে নিয়ে এর মধ্যে তার আত্মপরিচয় অনুসন্ধান করা। এবিষয়টি বোঝাতে গিয়ে ফ্রান্সিস ভন (Frances Vaughn) থেকে উদ্বৃতি নিয়ে দেভাল বলেন, "সবথেকে সুস্থ আত্মা হলো পারস্পরিক শর্তসাপেক্ষ সম্পর্কের এক জটিল জালের উন্মুক্ত প্রক্রিয়া" (Devall, 1988 : 41)। আমরা যখন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কটি বুঝতে পারি, প্রকারান্তরে উপলব্ধি করি প্রকৃতির উপর আমাদের নির্ভরশীলতা। আত্মসচেতনতার মাধ্যমে আমরা বোঝে নেব মানুষ হিসেবে প্রকৃতির প্রতি কিধরনের যত্ন-আত্মি নিতে হবে।

দেভালের অন্য এক বক্তব্যের সাহায্যে উপর্যুক্ত প্রসঙ্গটি বিচার করা যাক। তিনি বলছেন, যখনই আমরা প্রতিবেশগত আত্মার ধারণায় পৌঁছি তখন আনন্দের সঙ্গে তা প্রতিরক্ষার প্রয়াস চালাই, প্রকৃতির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় যাই। এর জন্য আলাদা কোনো পরিবেশ নীতিবিদ্যার তত্ত্ব চাপিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না। স্বাভাবিকভাবেই আমরা প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব, তাকে ভালোবাসব, সম্মান করব তথা প্রতিরক্ষার জন্য ভূমিকা রাখব একারণে যে, এরা আমাদেরই আত্মা (Devall, 1988, p.43)। মানুষ হিসেবে আমরা যখন নিজেদেরকে প্রকৃতির অংশ হিসেবে উপলব্ধি করি তখন একে শুধু এর মতো করেই যত্ন-আত্মি নেব না, বরং মানুষ হিসেবে আমরা আমাদের ব্যক্তি-আত্মাকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর আত্মার দিকে অভিগমনও করব। ব্যক্তি আত্মা থেকে বৃহত্তর আত্মার দিকে অভিমুখিতাই প্রতিবেশগত-আত্মাকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। তাহলে বৃহত্তর আত্মার ধারণা মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ককেই প্রতিপাদন করে। মানুষ ও প্রকৃতিকে বিরুদ্ধ অবস্থানে দাঁড় করায় না। সবমিলিয়ে বলা যায় : *প্রতিবেশগত আত্মা* প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্য, প্রাণবন্ত সত্তার সমতাবাদী সম্পর্ক ও পরিবেশসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়ার মানসিকতা নির্মাণ করতে পারে। সুতরাং, পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে জীবনমণ্ডলগত সমতাবাদের বিরুদ্ধে যে আপত্তি পর্যালোচনা করেছি তার একটি সমাধানও আমরা *প্রতিবেশগত আত্মার* ধারণায় পেতে পারি।

প্রতিবেশবাদী আত্মা প্রসঙ্গে অন্য একটি প্রসঙ্গ জানা যাক। নিবিড় প্রতিবেশবাদ কি ধর্মতত্ত্ব নাকি বৈজ্ঞানিক যুক্তির নিরিখে প্রণীত হয়েছে? উপর্যুক্ত প্রশ্নটি নিবিড় প্রতিবেশবাদের কাঠামোগত সমস্যার বিরুদ্ধে উত্থাপন করা যেতে পারে। এ প্রশ্নের উত্তরে নিবিড় প্রতিবেশবাদী নায়েস ও ফক্স উভয়ই মনে করেন : এ মতবাদ বৈজ্ঞানিক প্রতিবেশগত ধারণা বা যুক্তিবিদ্যক বা আরোহাত্মক কোনো প্রক্রিয়ার ফসল নয়। তবে উল্লিখিত জ্ঞানের আলোকেই নিবিড় প্রতিবেশবাদী অধিবিদ্যা ও আত্মা সম্পর্কিত ধারণার বিকাশ ঘটেছে (Naess 1973, p.99, Fox, 1984, pp.195, 197)। একইভাবে ফ্রেয়া ম্যাথুজও বলেন, নিবিড় প্রতিবেশবাদ আত্মা থেকে প্রকৃতির দিকে অভিযাত্রা। এটি প্রতিবেশবাদকে জগতের অধিবিদ্যাক কাঠামোর এক মডেলে পরিণত করেছে (Mathews, 1988, p.349)। নিবিড় প্রতিবেশবাদের অধিবিদ্যক দাবি বুঝতে হলে,

কিংবা এ মতবাদের *প্রসারমান আত্মার* (expanded Self) উপলব্ধি পাবার জন্য অবশ্যই বৈজ্ঞানিক পরিবেশবাদের প্রয়োজন রয়েছে। এ বিজ্ঞান পরিবেশের উপাদানসমূহের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের ব্যাকরণকে বুঝতে সাহায্য করে। এ কারণেই এটি হয়ে উঠতে পারছে পদ্ধতিগত মতবাদের (Systems theory) একটি সাধারণ শাখা (Capra, 1997, pp.32–35)। আর পদ্ধতিগত মতবাদ বিভিন্ন বস্তু বা পরিবেশের উপাদানের উপর প্রয়োগ করা যায়। যেমন, প্রাণবন্ত সত্তা, শহর, মানুষ নির্মিত কোনো যন্ত্র যেমন ওভেন, ফ্রিজ ইত্যাদিকে এই পদ্ধতিগত মতবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়।

উপর্যুক্ত প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করা যেতে পারে। যেমন, আমরা যদি পদ্ধতির কথা বলি তাহলে এর সাধারণ কতোগুলো বৈশিষ্ট্যকেও স্বীকার করে নিতে হবে। যেকোনো পদ্ধতিরই প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো "এটি কতোগুলো অংশবিশেষ থাকে যারা খুবই সন্নিকটবর্তী, এবং যেকোনো অবস্থায় এরা একত্রিত বা সমন্বিত হতে পারে (Mathews 1994, p.94)। অন্যভাবে বলা যায় — যেকোনো পদ্ধতি বা সিস্টেম হলো এর অংশ দ্বারা গঠিত। প্রতিটি ক্ষুদ্রাংশ এমনভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত যে, সমগ্রের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। যেমন, কোনো অর্গানিজম তার ভেতরে যে তাপমাত্রা উৎপন্ন হয় তা সুনির্দিষ্ট কোনো অংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় (Capra,1997, pp. 36 – 50)। অর্গানিজম, কমিউনিটি এমনকী গোটা জীবমণ্ডলই পদ্ধতিমাফিক প্রকৃতির কাঠামোয় গঠিত। এটিকে আমরা সনাক্ত (identify) করতে পারি। এরা সকলেই ক্ষুদ্র অংশবিশেষ দিয়ে তৈরি, কিন্তু তারা কতোগুলো অংশের সংগ্রহ এরকম ভাববার কোনো কারণ নেই। বরং প্রত্যেকটি অংশ পরস্পর যেভাবে সম্পৃক্ত, যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই এ সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেমন, ব্যক্তিসত্তাকে আমরা অর্গানিজম হিসেবে বিচেনা করতে পারি। এই অর্গানিজমও একটি সমন্বিত সমগ্র। এটি শুধুমাত্র কতোগুলো দেহাঙ্গ, বা কোষের সংগ্রহ, কিংবা এর কতিপয় গুণের সমাবেশ নয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রার কথা ধরা যাক, যা কোনো জীবসত্তার বিশেষ কোনো অংশের ধর্ম নয়। বরং, জীবসত্তার বিভিন্ন জৈবিক অংশের সমন্বয়ে, পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়ায় তাপের সৃষ্টি হয়ে থাকে (Mathews, 1994, p.95)। এই বিবেচনায় গোটা জীবমণ্ডল হলো একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি (system)। এটি গুণসমৃদ্ধ, আবহাওয়ামণ্ডল কিংবা অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ। এদের একটি থেকে অন্যটিকে বাদ দেওয়া যায় না। বরং এদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও সম্পর্কের মাধ্যমে পরিবেশগত সিস্টেম বা পদ্ধতি সৃষ্টি হয়ে থাকে (Lovelock,1995, pp.19-20)। এ বিবেচনায় মানুষ, প্রকৃতি, জীবমণ্ডল, আবহাওয়ামণ্ডল, এমনকী সৌরমণ্ডল এই সিস্টেমেরই ফসল। প্রতিবেশগত প্রসারমান আত্মা এই সামগ্রিক সিস্টেমের পক্ষে অবস্থান নেয়।

অন্য একটি উদাহরণের সাহায্যে উপর্যুক্ত বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। বিশেষ কারণে আমাদের বসবাসকারী প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি প্রাকৃতিক জগতে অস্তিত্বশীল অন্যান্য

প্রক্রিয়া থেকে আলাদা। কারণ বসবাসকারী পরিবেশমণ্ডল নিজেদের স্বতঃপ্রণোদনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে সৃজন করে থাকে। প্রকৃতির এই জটিল জালের মধ্যে এর প্রতিটি অংশ উৎপাদন বা রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এই জালটি কিন্তু এর অংশবিশেষ নিয়েই সৃজিত হচ্ছে। যেমন, এককোষী অর্গানিজমে ডিএনএ বিশেষভাবে আরএনএ উৎপাদন করে। আবার ডিএনএকে পরিশুদ্ধ করার জন্য বিশেষ এনজাইমের সাহায্য নিয়ে থাকে। এই যে প্রক্রিয়া এটিকে বলা হয় স্বয়ংক্রিয়া (autopoiesis) পদ্ধতি (বা প্রক্রিয়া)। অংশ ও সমগ্রের মিলিত প্রয়াসে সৃষ্ট এই স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে (Capra, 1997, pp. 161–164)। আবার ম্যাথুউজের ভাষায় অর্গানিজম হলো "আদি ও একমাত্র প্রক্রিয়া যা নিজেদের ব্যবস্থাপনাকে ক্রিয়াশীল করে তুলতে পারে, পুনঃসংস্কার বা সংশোধন করতে পারে। এটিকেই নায়েস ও অন্যান্য নিবিড় প্রতিবেশবাদীগণ *আত্মোপলব্ধি* হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অনেকসময় এটাকে *আত্মসংরক্ষণ* (self-preservation) ও *সৃজনশীল বিবর্তন* (creative evolution) নামেও আখ্যায়িত করা হয়। এটি মূলত প্রাণবন্ত প্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে (Mathews 1994 : 98, Naess 2000, p.166)।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাথুজ দাবি করছেন, কিছু কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে সক্রিয়ভাবে নিজেদের গঠন করে যা তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করে। একটি ব্যঙ যেভাবে পরিবেশ প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে, তেলাপোকা কিন্তু সেভাবে পরিবেশ-প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের অভিযোজন করে না। প্রাকৃতিক জগত সাপেক্ষে এই যে ভিন্নতা তাকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলা হয়। এই বৈশিষ্টসূচক শর্তটিই একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করে। উচ্চতর যে ক্রমপদ্ধতি (order systems) যার মাধ্যমে অর্গানিজমসমূহ সংগঠিত হয় সেটাই সামগ্রিকভাবে বাস্তুসংস্থান, প্রাণমণ্ডল, জীবমণ্ডল হিসেবে পরিচিত। সকল প্রক্রিয়াসমূহই স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া (autopoietic systems) হিসেবে নিজেদের বিকশিত করে। স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যেকটি সিস্টেম গঠিত হয়। একটি সিস্টেম থেকে অন্যটি আলাদা, স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যকেই নিবিড় প্রতিবেশবাদীগণ আত্মা হিসেবে গণ্য করেছেন (Mathews 1994, pp 130-142)।

ম্যাথুজ ও কেপরা'র আলোচনার সূত্র ধরেই বলা যায় — ব্যক্তিসত্তাকে বৃহত্তর আত্মায় রূপান্তরিত করা যায়। এই রূপারন্তকরণে প্রকৃতির বিভিন্ন অংশ সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। তাঁদের মতে, ব্যক্তি-আত্মা হলো "জীবমণ্ডলগত জালের সঙ্গে সম্পর্কিত এক জটিল সংবদ্ধ" যা উচ্চতর সংস্থান বা সিস্টেম সৃজন করে। যেমন, জীবমণ্ডল যা হলো স্বয়ংক্রিয় আত্মা (autopoietic self) তাও আত্মোপলব্ধি অর্জনের প্রয়াস চালায়। এজন্যই ম্যাথুউজ দাবি করেন, নিবিড় প্রতিবেশবাদীগণ *সনাক্তকরণ* (identification) ও *আত্মোপলব্ধির* (self–realization) জন্য গোটা জীবমণ্ডলকে আত্মা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যা আবার স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াও (autopoietic system)। যদি বৃহত্তর আত্মা

আত্মোপলব্ধিজাত না হয়, যদি এটি এর নিজস্ব সংরক্ষণশীলতা ও বিবর্তনের দিকে ধাবিত না হয় তাহলে এটি ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া হিসেবে পরিগণিত হবে।

ম্যাথুজের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোটা দাগের মন্তব্য হলো — প্রাণবন্ত ও অ-প্রাণবন্ত সত্তা উভয়ই স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার অধীন। এই অধীনতা যা থেকে আমাদের প্রাকৃতিক জগতও আলাদা হতে পারে না। গোটা প্রাকৃতিক জগতকেও এই নীতির আলোকে পরিচালিত হতে হয়। ম্যাথুজ এটিকে বলেছেন আত্মোপলব্ধি। এখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হলো বৃহৎ আত্মা যার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মা নিহিত রয়েছে। এই অভিমুখিতা আত্মার বহুত্বেরও স্বীকৃতি দেয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মা থেকে প্রসারমান আত্মার দিকে অভিমুখিতা রয়েছে। এই যে আত্মার বহুত্ব তাই প্রমাণ করে শুধু মানুষেরই আত্মা রয়েছে এধারণা সঠিক নয়। পাহাড়, নদী ও অরণ্য এদেরও আত্মা রয়েছে। আত্মার এই বিস্তৃতিকে ম্যাথুজ প্রসারমান আত্মার ধারণার সাহায্যে দিয়ে বুঝিয়েছেন। এই প্রসারমান আত্মার (extended self) যে স্বয়ংক্রিয়তা, সামর্থ্য, ক্ষমতা ও স্বশাসন রীতি কাজ করে, ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যেই এসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। নায়েসের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্যটি তাই বুঝে নিতে পারি। সামগ্রিকভাবে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা কসমস হলো বৃহত্তর আত্মা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই আত্মাকে বোঝার জন্য তাই কাঠামোগত কোনো রূপকই যথেষ্ট নয়। তিনি এ মতাদর্শিক অবস্থানটি নিয়েছেন আইনস্টাইনের পদার্থবিজ্ঞান, স্পিনোজার বিশ্বতত্ত্ব ও জিয়োমেট্রোডিনামিক্সের ধারণা থেকে। প্রশ্ন হলো নায়েসের সঙ্গে ম্যাথুজের পার্থক্য কোথায়? ম্যাথুজ প্রতিবেশকে দেখেছেন গতি পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু নায়েস পদার্থবিজ্ঞানের অবস্থান অপেক্ষা প্রতিবেশবিজ্ঞানকে (ecology) বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাকৃতিক জগতের প্রতিটি উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক লক্ষ করেছেন। অন্তর্নিহিত মূল্যের দিক থেকে তিনি এই আন্তঃসম্পর্ককে বিবেচনা করে ঔচিত্যের ধারণায় উপনীত হয়েছেন। কিন্তু জীবমণ্ডলে যে প্রাণবন্ত ক্ষমতা ক্রিয়াশীল রয়েছে যাকে সামগ্রিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মা হিসেবে বিবেচনা করা যায় সেদিকটির প্রতি নায়েস মনোযোগ দেননি। আত্মার প্রসারমান দৃষ্টিকোণ জগতকে দেখেছে একটি শক্তি ও স্বয়ংক্রিয়তার আধার হিসেবে। জিয়োমেট্রোডিনামিক্সের প্রভাবে ম্যাথুজ এরকম বিজ্ঞানসম্মত ধারণায় উপনীত হতে পেরেছেন, নায়েস প্রাণের ধারণাকে অনেকটা অধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেছেন। উক্ত বিবেচনায় নায়েসের মৌলিক দাবিটি পুনসংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

৩.৪ ফক্সের বহুব্যক্তিক আত্মা (transpersonal self) : নায়েসের মতবাদের পুনঃসংস্কার

নিবিড় প্রতিবেশবাদ আত্মার ধারণাকে জগত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও এর অংশগত দিকের সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতা বোঝাতে গিয়ে সনাক্তকরণের (identification) দৃষ্টিকোণকে ব্যবহার করেছেন। পূর্বের অনুচ্ছেদে আমরা সনাক্তকরণ ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করেছি।

প্রতিবেশগত আত্মার এই ধারণাটি মূলত নায়েসের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সনাক্তকরণের পাশাপাশি তিনি আত্মোপলব্ধির উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। জগতে নিজেকে সত্তাবান করে তোলার একধরনের প্রতিবেশগত দৃষ্টিকোণ লক্ষ করি তাঁর এই দর্শনে। এ দর্শনে সংকীর্ণ ব্যক্তি আত্মা বা ন্যুনাধিক আত্মার (minimal self) সীমানা ছাড়িয়ে যাবার পরামর্শ রয়েছে। একারণে তিনি প্রতিবেশগত আত্মাকে (ecological self) সনাক্ত করেছেন এমনকিছু হিসেবে যার সঙ্গে ব্যক্তি তার নিজেকে সনাক্ত করতে পারে। সনাক্তকরণকে তিনি বুঝেছেন আত্মপরিচয় হিসেবে নয়, একে তিনি বুঝেছেন তীব্র সহানুভূতি (intense empathy) ও বাস্তবসম্মত সমবেদনার পূর্বশর্ত হিসেবে। আত্মা প্রসঙ্গে এধরনের পরিপক্ব দৃষ্টিকোণ অনুশীলন করার প্রস্তাব করেছেন নায়েস।

প্রতিবেশগত আত্মার সন্নিকটবর্তী হবার উপায় হলো *আত্মোপলব্ধি* ও *সনাক্তকরণ*। এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভাবনা তৈরি করা। আত্মা সম্পর্কে নায়েসের ধারণাকে বোঝার জন্য, কিংবা তার দর্শনের সীমাবদ্ধতা সনাক্ত করার জন্য ভারভাইক ফক্সের আত্মা সম্পর্কে ধারণাটি বোঝে নিতে পারি। প্রতিবেশগত আত্মার ধারণাটি বিকশিতভাবে উপস্থাপন করেছেন ভারভাইক ফক্স (1995)। ফক্স লক্ষ করেছেন আত্মাকে তিনটি প্রচলিত ধারণায় সনাক্তকরণ করা যায়:

ক. ব্যক্তিক আত্মার (personal soul) জন্য ব্যক্তিক সনাক্তকরণ

খ. তত্ত্ববিদ্যাগত আত্মার (ontological soul) জন্য তত্ত্ববিদ্যক সনাক্তকরণ

গ. মহাজাগতিক (cosmological) সনাক্তকরণ

ব্যক্তিক আত্মার ধারণাটি খুবই পরিচিত। যেমন আমার পরিবার, আমার দেশ, আমার ফুটবল টিম ইত্যাদি হলো ব্যক্তিক আত্মার দৃষ্টান্ত। ফক্স লক্ষ করেছেন, ব্যক্তিক আত্মার দৃষ্টিকোণে সনাক্তকরণে কিছু সমস্যা রয়েছে। এটি আমাদের মোহবন্ধনে আবদ্ধ করে, মালিকানার অহমিকা জাগায়। এতে করে জাতিগত ফাঁদ তথা বদমেজাজি ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, আমার ক্রিকেট টিমই উৎকৃষ্ট এই ভাবনা অন্যদেশের ক্রিকেট টিমের প্রতি হেয়পূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। এই হেয়পূর্ণ ভাবটি আত্মোপলব্ধিকে ব্যহত করে থাকে। ব্যক্তিক সনাক্তকরণের প্রয়াস অনেকসময়ই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বৃহত্তর পরিসরে পরিবেশগত অবিচারকে উৎসাহিত করতে পারে। এজন্য তিনি ব্যক্তি আত্মার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ব্যক্তিক সনাক্তকরণ ছাড়াও সনাক্তকরণের আরেকটি ধারা রয়েছে। ফক্স এর নাম দিয়েছেন *বহুব্যক্তিক আত্মা* (transpersonal self)। *আত্মার* ব্যক্তিক ও সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণের ঊর্ধ্বে এর অবস্থান। ফ্রান্সিস ভনের আত্মা সম্পর্কিত দর্শন অবলম্বনে তিনি এ ধারণাটির বিকাশ ঘটিয়েছেন। স্বরূপগতভাবে *তত্ত্ববিদ্যাগত সনাক্তকরণ* হলো খুবই জটিল। এটিকে ব্যাখ্যা করা যায় প্রাকৃতিক উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল সচেতনতার দৃষ্টিকোণ হিসেবে। অনেকটা জেন (Zen) সচেতনতার মতো। এখানে সচেতনতা ও শৃঙ্খলা নির্ভর করে আছে অনুধ্যান, যোগের অনুশীলনের উপর। অন্যদিকে মহাবৈশ্বিক

সনাক্তকরণ (cosmologically based identification) হলো আরো বেশি ব্যাপক ও বিস্তৃত। মহাবৈশ্বিক সনাক্তকরণের মাধ্যমে বহুব্যক্তিক আত্মাকে উপলব্ধি করা, চেনা যায়। বহুব্যক্তিক আত্মা হলো প্রাণের বিশাল জালের ভিত্তি। এ জালের মধ্যে প্রাণের একটি মাত্রার সঙ্গে অন্যমাত্রাটি গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ। সম্পর্কের দিক থেকে এরা অবিচ্ছন্ন। এজন্য বহুব্যক্তিক আত্মাকে মহাজাগতিক সনাক্তকরণ রীতিতে বুঝতে হবে। কোনো ঘটনার গভীর উপলব্ধি নিয়ে যে সাধারণ মামুলি অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে যা হলো একক অ-বদ্ধ বাস্তবতা (single unfolding reality)। জগত, বস্তু ও স্থান সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে যে বোধ-বুদ্ধির সমর্থন জোগাচ্ছে বৃহত্তর অর্থে তা অ-মানবকেন্দ্রিক (nonanthropocentric)। অ-মানবকেন্দ্রিক ভাবনা পারে আমাদেরকে অ-বদ্ধ বাস্তবতায় উপনীত করতে। এটিকে তিনি তুলনা করেছেন শাখা প্রশাখা সংবলিত একটি বিশালাকৃতির গাছের সঙ্গে। এটি কোনো গাছের পাতা বা শাখাকে বোঝায় না। শাখা প্রশাখার বিস্তৃতি ও এর বহুমাত্রিক প্রয়োজন নিয়েই গাছের পরিপূর্ণ প্রকাশ। বহুব্যক্তিক আত্মাকে ব্যক্তিক বা তত্ত্ববিদ্যক আত্মার সাহায্যে বোঝা যায় না।

বহুব্যক্তিক আত্মা, আত্মোপলব্ধি ও নিবিড় প্রতিবেশবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ফক্স তিনটি ধরনের কথা বলেন : আকারগত (formal), দার্শনিক (philosophical) ও মামুলিভাবে (popular)। আকারগত ধারাটি আমাদের প্রতিবেশগত সম্পর্কের স্বরূপ নিয়ে গভীর ও তীক্ষ্ম প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে। যেকোনো ধরনের ধর্মীয় ও দার্শনিক সর্বাত্মবাদ এধরনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে থাকে। অন্যদিকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণটি বিকশিত হয়েছে নায়েসের ইকোসফি-টি'র আলোকে। আর মামুলি দৃষ্টিকোণটি হলো মূলত র‍্যাডিকেল প্রতিবেশকেন্দ্রিকতা থেকে উদ্ভূত। এ ধারাটি নায়েসের ইকোসফি-টিকে অনুমোদন দিয়ে থাকে। যেমন, কেউ যখন বলে "আল্পস পর্বত বা Tvergastein পাহাড় দীর্ঘজীবী হোক"। তখন ব্যক্তির মামুলি ভাবটিই এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। নিবিড় প্রতিবেশেবাদের উপর্যুক্ত শ্রেণিকরণ করে ফক্স দেখাতে চাচ্ছেন নায়েসের মতবাদ কিভাবে অসংগতিপূর্ণ হয়ে উঠছে। নিবিড় প্রতিবেশবাদ সম্পর্কে নায়েস যা বলেন তার সমালোচনায় ফক্স বলছেন "আমরা যতোটুকু বুঝতে পেরেছি নিবিড় প্রতিবেশবাদ হলো প্রতিবেশ বা জগতের প্রাণবন্ত সত্তা প্রসঙ্গে একটি প্রতিবেশকেন্দ্রিক মতাদর্শ। তিনি আত্মোপলিব্ধর প্রসঙ্গও নিয়ে এসেছেন। এরকম দোটানায় কারো পক্ষে বোঝা মুশকিল এটি পরিণতিতে প্রতিবেশকেন্দ্রিক নাকি মানবকেন্দ্রিক মতাদর্শ (Fox, 1995)। নায়েসের ইকোসফি-টি'র এই অসংগতি দূর করার দার্শনিক অভিপ্রায় হিসেবে তিনি বহুব্যক্তিক আত্মার প্রস্তাব করেছেন।

4 উপসংহার

নিবিড় প্রতিবেশবাদ জগত প্রকৃতিকে দেখেছে এক বিশেষ সমগ্র হিসেবে। এই সমগ্রের প্রতিটি উপাদানের রয়েছে অন্তর্নিহিত মূল্য। উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে আন্তঃসম্পর্ক।

এই আন্তঃসম্পর্কে উচু বা নীচু এরকম বিষম কোনো ধারণা নেই। তারা বরং এই বিষমতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা *প্রাণবন্ত সমতাবাদকে* গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য আছে এটাই প্রকৃতিকে বোঝার জন্য পর্যাপ্ত বা একমাত্র উপায় নয়। এই উপলব্ধির কারণে নিবিড় প্রতিবেশবাদীগণ *প্রতিবেশগত মূল্যের* প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ পোষণ করেছেন। তাই বলে মূল্যের ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রকৃতিকে রক্ষায় পরার্থবাদী প্রভাবকেও সমর্থন করেননি। প্রকৃতি প্রসঙ্গে পরার্থবাদী ভাবনার অর্থ হলো নিজেকে প্রকৃতি থেকে আলাদা, অধীনস্থ ভাবারই সামিল। এজন্য তিনি প্রস্তাব করেছেন প্রকৃতিকে বুঝতে হবে বিশ্বাত্মার সঙ্গে তুলনা করে না। এই বিশ্বাত্মাই প্রতিবেশগত আত্মা। ব্যক্তি আত্মার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে কেবল বিশ্বাত্মার উপলব্ধি সম্ভব। এই সম্ভাবনাকে দার্শনিকীকরণ করে তুলতে তিনি আত্মোপলব্ধির ধারণা নিয়ে এসেছেন। আত্মোপলব্ধিই পারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম-অবস্থানকে সনাক্ত করতে।

নিবিড় প্রতিবেশবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো জগতের প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে অন্যসব উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ককে স্বীকার করে নেওয়া। তবে এ মতবাদ এটাও মনে করে যে, একমাত্র সম্পর্ক স্বীকার করার মাধ্যমে এর সমগ্রকে সনাক্ত করার যথোপযুক্ত পদ্ধতি নয়। আবার অনেকক্ষেত্রে নিবিড় প্রতিবেশবাদীগণ মনে করেন, বৃহত্তর-আত্মা ও ব্যক্তি-আত্মা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, নায়েস প্রতিবেশকে উপলব্ধি করার এরকম ক্রমান্বয়িক প্রক্রিয়াকে বাতিল করে সামগ্রিক ও ব্যক্তি উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে সমান গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছেন। এজন্য এই সম্পর্ককে নিবিড় প্রতিবেশবাদ এক ও অভিন্ন আত্মার পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখতে বলেছেন। বিশেষ ব্যক্তি আমি ও প্রকৃতি সম্পূরক জালে সংবদ্ধ। বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে আমার, কিংবা প্রকৃতির সম্পর্ক অ-পারস্পরিক (non-relational) নয়। এটি নিত্যন্তই পারস্পরিক (relational) ও সম্পূরক (rereprocal)।

উপর্যুক্ত আলোচনা সূত্র ধরে বলা যায় : নিবিড় প্রতিবেশবাদে যে আত্মার কথা বলা হয়েছে তা প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে অ-বোধগম্য। তবে সাধারণ অর্থে মনোবিজ্ঞানে যেভাবে আত্মাকে বোঝায় ঠিক সেই অর্থে একে গ্রহণ করা হয়নি। এ মতবাদ আত্মাকে দেখেছে বৃহত্তর কলেবরে। তবে বিষয়টি এরকম নয় যে, আমরা যদি আত্মা সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত মতধারাকে পরিবর্তন করি তাহলে ব্যক্তির সত্তার মধ্যকার স্বার্থের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারব। আত্মার এধারণায় একটি বিষয় খুবই স্পষ্ট। আমরা যদি জগতের প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটায় তাহলে আমাদের আত্মার মধ্যেও এই পরিবর্তন সংঘটিত হবে। আত্মার পরিবর্তন জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে, কিংবা জগতের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে আমরা কিভাবে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করি তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অধিকন্তু, নিবিড় প্রতিবেশবাদ গোটা প্রকৃতিকে একক আত্মা হিসেবে বিবেচনা করতে প্রয়াসী। অংশ ও সমগ্রের মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকার পাবে এরকম

বিবেচনা এখানে গুরুত্বহীন। সমগ্র কিংবা ব্যক্তিসত্তা কোনোটিই এখানে মৌলিক নয়। আমরা ব্যক্তিকে যখন সমগ্রের অংশ হিসেবে দেখি, তখন সমগ্রের সঙ্গে অংশের যে পার্থক্য সূচিত হয় তাও বিবেচনায় রাখি। এই পার্থক্য পরস্পরের প্রতি কম বা বেশি গুরুত্ব দেবার প্রস্তাব করে না। তবে সামগ্রিক আত্মার ধারণাটি আমাদের পরিবেশবাদী মনোভাব গঠনের জন্য যথেষ্ট সহায়ক। সবমিলিয়ে বলা যায় — নিবিড় প্রতিবেশবাদ সর্বব্যাপক আত্মার প্রস্তাব করেছে যার মধ্যে ক্ষুদ্র আমি-আত্মা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই বলে প্রকৃতির প্রতি আমাদের পরার্থবাদী হওয়া দরকার নেই। বরং গোটা বিশ্বকে আত্মোপলব্ধি করতে পারলেই পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের ভাবনা অর্থবহ হয়ে উঠবে। এ বিবেচনায় পরিবেশবাদী মতবাদ হিসেবে নিবিড় প্রতিবেশবাদের গুরুত্ব অনেক।

তথ্যনির্দেশিকা

Brown, Charles S., and Ted Toadvine, eds. 2003. *Eco-Phenomenology: Back to the Earth Itself*. Albany: State University of New York Press.

Capra, F., 1997: *The Web of Life, a new synthesis of mind and matter,* London : HarperCollins Publishers.

Carson, Rachel, 1962. *Silent Spring,* Fawcett Publications Inc, Greenwich Conn.

Bookchin, Murray. 1987 . "Social Ecology versus 'Deep Ecology.' " *Green Perspectives,* 4–5 (Summer).

Botkin, Daniel B. 1990. *Discordant Harmonies: A New Ecology for the Twenty-First Century.* NY : Oxford University Press.

Devall, Bill, 1988. *Simple in Means, Rich in Ends: Practicing Deep Ecology*. Salt Lake City, UT: Peregrine Smith.

Devall, Bill and George Sessions, 1985. *Deep Ecology: Living As If Nature Mattered*. Salt Lake City, UT: Peregrine Smith.

Drengson, Alan and Yuichi Inoue, eds. 1995. *The Deep Ecology Movement: An Introductory Anthology,* Berkeley, California: North Atlantic.

Ferry, L. 1995. *The New Ecological Order*, Chicago: University of Chicago Press.

Foreman, Dave, 1991. "Second Thoughts of an Eco-Warrior", in Foreman, Dave, and Bookchin, Murray, 1991. *Defending the Earth : A Debate*, New York, Black Rose Books

Fox, W., 1990 (1995). *Towards a Transpersonal Ecology: Developing New Foundations for Environmentalism,* Devon : Resurgence Books.

Fox., W., 1998: "The Deep Ecology – Ecofeminism Debate and its Parallels" in Zimmerman, M. (ed.) *Environmental Philosophy, from animal rights to radical ecology,* New Jersey, Prentice-Hall Inc.

Keller, David R., 2009. Deep Ecology, in Callicott, J. Baird and Frodeman, Robert, eds. *Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy,* Vol. 1, Gale Cengage (Macmillan Reference USA).

Lovelock, J., 1995: *The Ages of Gaia: A biography of our Living Earth* [2nd edition], Oxford : Oxford University Press.

Milbrath, Lester, 1984. *Environmentalists: Vanguard for a New Society,* Albany: State University of New York Press.

Mathews, F., 1988: “Conservation and Self- Realization: A deep ecology perspective”, in *Environmental Ethics* 10.

Mathews, F., 1994: *The Ecological Self,* London : Routledge.

Naess, A., 1973. “The Shallow and the Deep, Long-range Ecology Movement: A Summary”, *Inquiry*, 16.

Naess, Arne, 1984. “A Defence of the Deep Ecology Movement”, *Environmental Ethics,* Vol 6, Issue 3,

Naess, Arne, (2000) (1989). *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of Ecosophy*, [tr. David Rothenberg], Cambridge : Cambridge University Press.

Norton, Bryan. 1991. *Toward Unity Among Environmentalists*. New York: Oxford University Press.

Reed, Peter and Rothenberg, David (ed.) 1987. “From 'Is it painful to think? A discussion with Arne Naess”, in *Wisdom and the Open Air,* University of Oslo: Council for Environmental Studies.

Sessions, George, ed. 1995. *Deep Ecology for the 21st Century*, Boston: Shambhala Publications.

Watson, Richard A. 1983. ‘‘A Critique of Anti-Anthropocentric Biocentrism.’’ *Environmental Ethics* 5(3): 245–256.